তেল দেবেন ঘনাদা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বেঙ্গল পাবলিশার্স
রেসনস্
৯৪ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭

শ্রীশশধর রাহা

ও

শ্রীমতী গীতশ্রী রাহাকে

গভীর স্নেহ ও প্রীতির সঙ্গে

আন্তর্জাতিক
শিশুবর্ষে
আনন্দ-উপহার

১

"জানেন আর মাত্র উনিশ বছর বাদে কী হবে ?"

"সারা তুনিয়ার তেল নিয়ে নবাবি আর উনিশ বছর বাদেই শেষ, তারপর খনির গ্যাস পাবেন মেরেকেটে আর একটা বছর মাত্র !"

"জানেন, আমাদের যা শেষ ভরসা, সেই কয়লার একটা গুঁড়োও একশো দশ বছর বাদে কোথাও খুঁজে পাবেন না ?"

কথাগুলোর নমুনা দেখেই কোথায় কাকে উদ্দেশ করে সেগুলো বলা, তা অনুমান করতে কারুর ভুল হয়নি বলেই বুঝতে পারছি।

হ্যাঁ, কথাগুলো বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের টঙের ঘরের সেই একমেবাদ্বিতীয়ম ঘনাদাকে উদ্দেশ করেই বলা।

অনুমান ওইটুকু পর্যন্ত ঠিক হলেও তারপরই একেবারে ভুল।

না, এসব কথা তাঁর টঙের ঘরে' নিজের তক্তপোশে আসীন ঘনাদাকে তাতিয়ে একটা গল্পের ফুলকি বার করবার জন্যে ভান করা

মেজাজ দেখিয়ে খোঁচানো নয়।

রাগটা আমাদের যথার্থ, আর সত্যিই ঘনাদার ওপর একেবারে খাপ্পা হয়ে সবাই মিলে তাঁকে আমরা টঙের ঘরে পৌঁছোবার আগেই সেই ন্যাড়া সিঁড়ির ওপর থেকে আক্রমণ শুরু করেছি।

স্বীকার করছি যে রাগটা আমাদের মাত্রা ছাড়া, আর ঘনাদার ওপর ওরকম সত্যিকার তর্জন-গর্জনও প্রায় কল্পনাতীত।

কিন্তু এমন একটা অভাবিত ব্যাপারের মূল কারণটা শোনালে আমাদের এই অবিশ্বাস্য বেয়াদবির জন্যে অনেকের কাছে হয়ত ক্ষমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ সহানুভূতিও পেতে পারি, এই আশাতেই সমস্ত ঘটনাটা গোড়া থেকে জানাচ্ছি।

ব্যাপারটা সেই সকালবেলাতেই শুরু। ছুটির দিন। আমরা সবাই একটু দেরি করেই আড্ডা-ঘরে এসে একে-একে জমায়েত হতে শুরু করেছি। টঙের ঘর থেকে ন্যাড়া সিঁড়ি দিয়ে ঘনাদার ধীরে সুস্থে নেমে আসার শব্দও সবে পাওয়া যাচ্ছে, এমন সময় নীচে থেকে অচেনা গলার হাঁক, "শিবু, শিবু আছ তো?"

গলাটা খুব বাজখাঁই নয়, কিন্তু ডাকটায় বেশ একটু মাতব্বরি সুর আছে।

এই সক্কালবেলা এই গলায় শিবুকে ডাকতে এল কে এবং কেন?

শিবুও প্রথমটায় বুঝি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর তার মুখখানার লোডশেডিং যেন কেটে গেল।

"আরে, এ তো পল্টু! সত্যি এসেছে তা হলে! গাড়িও এনেছে নিশ্চয়। চলো, চলো।"

নিজের উৎসাহে আমাদের সকলকেও ঢালাও নিমন্ত্রণ জানিয়ে শিবু যে-রকম হন্তদন্ত হয়ে নীচে নেমে গেল, তাতে তার সঙ্গে পাল্লা

দেওয়া শক্ত। তবু যথাসাধ্য সে চেষ্টা করতে-করতে নিজেদের কৌতূহল-গুলো যথাসাধ্য মেটাবার চেষ্টা করলাম, "কে পল্টু? কোথা থেকে কেন এসেছে? গাড়ি আবার এনেছে কী?"

প্রথম দুটো প্রশ্নের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত যে জবাব পেলাম তাতে জানা গেল, পল্টু শিবুর একরকম মামাতো ভাই। তাকে কথা দিয়েছিল বলেই এমন সাতসকালে দেখা করতে এসেছে।

আর গাড়ি যা এনেছে, তা নিজের চোখেই দেখলাম বাহাত্তর নম্বরের বাইরের গলিতে।

না, রদ্দি ঝরঝরে মল্লিক বাজারের জোড়াতালি-দেওয়া মাল নয়, সত্যি-সত্যি নতুন মডেলের নামকরা কোম্পানির গাড়ি। ঝকঝক চকচক করছে এমন, যেন সবে মোড়ক খুলে বার করা হয়েছে।

শিবুর মামাতো পিসতুতো মাসতুতো ভাইয়েদের 'লিস্ট' বেশ লম্বা। বাহাত্তর নম্বরে কিছুদিন থাকলে তাদের সকলের সঙ্গে এক-আধবার পরিচয় না হয়ে পারে না।

পল্টুবাবু তাদের মধ্যে নতুন। প্রথমে শুধু গলাটা শুনে আওয়াজটা একটু ভারী আর সুরটা বেশ মাতব্বরি ধরনের লাগলেও মানুষটা দেখলাম, আমাদেরই বয়সী, ছোটখাটো নরম-নরম চেহারার।

আমাদের সকলকে একসঙ্গে দেখে একটু যেন লাজুক-লাজুক ভাবেই শিবুকে বললেন, "কেমন, নিয়ে এলাম কিনা? এখন কোথায় যেতে চাও বলো!"

এরপর শিবুর কাছে সমস্ত ব্যাপারটার ব্যাখ্যা শুনতে আমাদের দেরি হল না। ব্যাপারটা হল এই যে, শিবুর কীরকম মামাতো ভাই পল্টুবাবু কিছুদিন হল এক বড় কোম্পানির মোটর-বিক্রির দালালির কাজ পেয়েছেন। শিবুর সঙ্গে এর মধ্যে কবে দেখা হতে পল্টুবাবু

তাকে নতুন মোটর চড়াবেন কথা দিয়েছিলেন। সেটা যে মিথ্যে চাল-বাজি নয়, তাই প্রমাণ করতেই পল্টুবাবু আজ সকালে সত্যি-সত্যি গাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছেন বাহাত্তর নম্বরে।

"একটা কথা বলতে পারি?"

সবাই যে চমকে উঠে আমাদের পেছনে ঘনাদাকে লক্ষ করে এবার রীতিমতো লজ্জিত হয়েছি, তা বলাই বাহুল্য। শিবু-পল্টু-সংবাদ শুনতে-শুনতে আর ছুটির দিনের সকালের এই সুবর্ণ সুযোগের সার্থক সদ্ব্যবহারটা কীভাবে হতে পারে ভাবতে-ভাবতে ঘনাদার কথাটা এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলাম।

নিজেদের ত্রুটিটা শোধরাবার জন্যে শশব্যস্ত হয়ে উঠলাম তাই। প্রায় সমস্বরে সবাই বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন না। বলুন না।"

ঘনাদা বললেন। বিশেষ কিছু নয়, জানালেন যৎসামান্য একটা অনুরোধ। আমরা যতক্ষণ গাড়ি নিয়ে কোথায় যাব ঠিক করছি, তার মধ্যে তাঁকে যদি এ-গাড়ি নিয়ে দু'পা একটু পৌঁছে দেওয়া হয়।

বলে কী ঘনাদা! এমন একটা গাড়ির সুবিধের দিনে আমাদের ফেলে একলাই আগে কোথায় যেতে চায়! কিন্তু হাঁ হাঁ করে উঠে বাধা দেওয়া আর হল না।

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। যান না," আমাদের সকলের আগে পল্টুবাবুই ব্যস্ত হয়ে ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন, "ড্রাইভারজি, লে যাইয়ে সাবকো যাঁহা যানে চাহতে হেঁ।"

ড্রাইভারজি মোটরের দরজা খুলে দিলেন। ঘনাদা গাড়িতে উঠে বসলেন। ড্রাইভারজি তাঁর আসনে বসে দুবার হর্ন বাজিয়ে আমাদের বনমালী নস্কর লেন থেকে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের চোখের ওপর যখন ঘটল, তখন প্রায় কাঁটায়-কাঁটায় সকাল সাতটা।

গাড়ি চলে যাবার পর পল্টুবাবুকে নিয়ে আমাদের একটু ওপরে গিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কী করবার আছে।

ঘনাদা বলেছেন, তাঁকে দু'পা মাত্র পৌঁছে দিতে হবে। তা দু'পা মাত্র যেতে আসতে আর কতক্ষণ!

কিন্তু সাতটা বেজে সাড়ে সাতটা হল। সাড়ে সাতটা থেকে ঘড়ির কাঁটা পৌঁছল আটটায়। আটটার পর নটা বাজল। বাজল দশটা।

তবু ঘনাদাকে যথাস্থানে রেখে পল্টুবাবুর গাড়ি ফেরত এল কই?

ততক্ষণে তিন-তিনবার চায়ের পালা আমাদের শেষ হয়ে গেছে। প্রথমে শুধু পাঁপর ভাজাই ছিল টাকনা, তারপর সেটা পাড়ার দোকানের হিঙের কচুরি থেকে শেষে তেলেভাজা-বেগুনিতে গিয়ে

উঠল, তবু গাড়ির দেখা নেই।

বেগুনি-ফুলুরি তখন আর মুখে রোচে! শিবুর মামাতো ভাই পল্টুবাবুর মুখের দিকে চেয়ে অন্তত নয়। কোন লাভ নেই জেনেও ওপর থেকে নীচে আর বাহাত্তর নম্বর থেকে বেরিয়ে বনমালী নস্কর লেন ছাড়িয়ে বড় রাস্তা পর্যন্ত অমন বার দুই যাওয়া-আসা করলাম। পল্টুবাবুর গাড়ি তখনও নিপাত্তা।

দশটা ক্রমে ক্রমে এগারোটা হল। তারপর বারোটা! আরও বার দশেক ওপর-নীচ আর ঘর-বার করে, গাড়িটার কোথাও কোন অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে বলেই ধরে নিয়ে আমরা পাড়ার থানায় খোঁজ করতে যাব বলে নামতে যাচ্ছি, এমন সময়ে বনোয়ারী নীচে থেকে খবর দিলে, "গাড়ি আওত বানি!" অর্থাৎ গাড়ি আসছে।

সবাই মিলে এর পরে হুড়মুড় করে নীচে নেমে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বনোয়ারীর খবর ভুল নয়। গাড়ি মানে পল্টুবাবুর গাড়িই আসছে বটে, তবে সেটাকে ঠেলে নিয়ে আসছে রাস্তার ক'জন মজুর।

কী হয়েছে তা হলে? দারুণ কোনো দুর্ঘটনা? না। গাড়ি সম্পূর্ণ অক্ষত। তা থেকে প্রথমে যিনি নামলেন, সেই ঘনাদাও সম্পূর্ণ তা-ই।

নেমে এসে বাহাত্তর নম্বরের দেউড়িতে ঢোকবার আগে আমাদের দিকে চেয়ে ঈষৎ যেন দুঃখের সঙ্গে বললেন, "একটু দেরি হয়ে গেল, না?"

একটু দেরি হয়ে গেল! সাতটায় দু'পা পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে বেলা বারোটার পরে ফিরে ঘনাদা বলছেন কিনা, একটু দেরি হয়ে গেল!

বিহ্বল, হতভম্ব তো হয়েই ছিলাম, তার ওপর ঘনাদার এই আত্ম-ধিক্কারের আতিশয্যে অভিভূত হয়ে সবাই যেন বোবা হয়ে গেলাম।

কথা ঘনাদাই আবার বললেন। যেন হঠাৎ তুচ্ছ একটা কথা মনে পড়ায় আমাদের জানিয়ে দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ওই গাড়ি যারা ঠেলে এনেছে, তাদের মজুরির সঙ্গে কিছু-কিছু বকশিশও দিয়ে দিও। কমখানি তো নয়, প্রায় মাইল দুয়েক ঠেলে আনছে।"

পায় মাইল দুয়েক ঠেলে আনছে! এবার একসঙ্গে হঠাৎ সলতে-ধরে-ওঠা বোমার মতো আমরা ফেটে পড়লাম।

"ঠেলে আনছে কেন?" জিজ্ঞাসা করলে শিবু।

"গাড়ির কি কোন অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে কিছু?" জানতে চাইলাম আমি।

"ইঞ্জিন কি কলকব্জা কিছু বিগড়েছে?" কড়া গলায় জেরা করল গৌর।

"না, না, কলকব্জা বেগড়াবে কী!" ঘনাদা যেন পল্টুবাবুর গাড়ির অপমানে ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, "দস্তুরমতো ভাল নিখুঁত নতুন গাড়ি।"

"তবে?" শিশিরের মাত্র একটি শব্দের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন।

"তবে আর কী!" ঘনাদা আমাদের বুদ্ধির স্থূলতাতেই যেন হতাশ হয়ে বললেন, "গাড়িতে তেল ছিল না, তাই।"

"তেল ছিল না!"

আর্তনাদটা এবার আমাদের নয়, পল্টুবাবুর গলা দিয়ে বার হল, "আমি যে এখানে আসবার আগে নিজে দাঁড়িয়ে ট্যাঙ্ক ভর্তি করে তেল এনেছি। ট্যাঙ্কে কোথাও কোনো ফুটো..."

পল্টুবাবুকে কথার মাঝখানেই থামিয়ে ঘনাদা আশ্বাস দিয়ে বললেন, "ট্যাঙ্ক ফুটো-টুটো কেন হবে। পুরো ট্যাঙ্ক-ভর্তি তেলই

ছিল। সবটা অমন এখানে ফেরবার আগেই ফুরিয়ে যাবে সেইটে ঠিক বুঝতে পারিনি।”

নীচের সিঁড়ি দিয়ে তখন আমরা দোতলার বারান্দায় এসে পৌঁছেছি। ঘনাদার সরল বিনীত স্বীকারোক্তিটুকুর পর কয়েক সেকেণ্ড রীতিমতো হতবাক হয়ে থাকবার পর নিজেদের আর সামলানো সম্ভব হল না।

“তার মানে,” শিশির প্রায় চিড়বিড়িয়ে উঠে বললে, “ওই ট্যাঙ্ক-ভর্তি তেল সব আপনি খরচ করে এসেছেন?”

“এই আজকের দিনে তেলের জন্যে যখন সারা দুনিয়ায় হাহাকার পড়ে গেছে!”

“এক ফোঁটা তেলের জন্যে যখন দেশে-দেশে গলাগলির বন্ধুত্ব গলা-টেপাটেপিতে পোঁছে যাচ্ছে।”

“আপনি কি জানেন না যে, তেলের দাম দিন-দিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় নয়, মিনিটে-মিনিটে কীভাবে বাড়ছে! আর আজকের পৃথিবীতে তেলের বাদশা আরবেরা হঠাৎ তেলের বাজারের চাবিকাঠিটি নিজেদের হাতে নেবার পর সারা দুনিয়ার কীভাবে টনক নড়েছে!”

“হিসেব করতে বসে কেন সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে জানেন? জানেন যে, আরবরা হাতের মুঠো খুলুক বা না খুলুক, দুনিয়ার ভবিষ্যৎ পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে আসতে আর দেরি নেই!”

এই পর্যন্ত বলতে বলতেই টঙের ঘরের ন্যাড়া সিঁড়ির তলা পর্যন্ত আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমাদের জবরদস্ত ঘেরাওয়ের ধরনে সিঁড়ির দিকটা আটকানো বলে ঘনাদাকে এবার আড্ডাঘরেই ঢুকতে হয়েছে।

সেখানে ঢুকেও অবশ্য তিনি নিস্তার পাননি। এ-বিবরণ যা দিয়ে

শুরু করেছি সেই সব বাক্যবাণ তাঁর ওপর তখন নির্মমভাবে ছোঁড়া হয়েছে। একজন থামতে-না-থামতে আর-একজন শুরু করে। এক মুহূর্তের সামলাবার ফাঁক তাঁকে দেওয়া হয়নি।

শিশির কয়লার আসন্ন চরম দুর্ভিক্ষের বিভীষিকার কথাটা শুনিয়ে দেবার পরেই গৌর একেবারে সর্বনাশা ছবিটা অঙ্কের হিসেবে এঁকে দিয়েছে। এ-সব হিসেবে সে এমনিতেই একটু পাকা। তার ওপর ঘনাদার জন্যে সারা সকাল অপেক্ষা করায় অধৈর্য আর যন্ত্রণার মধ্যে নানা কাগজপত্র এই জন্যেই সে হাঁটকাচ্ছিল নিশ্চয়।

"আপনি যা করেছেন," গলা থেকে যেন আগুনের হলকা বার করে গৌর বলেছে, "তা আজকের দিনে রীতিমতো একটা সামাজিক অপরাধ, তা জানেন! মরুভূমির যাত্রী হয়ে খুশির খেয়ালে তেষ্টার জল নষ্ট করা যা, এও তা-ই।"

গৌরের আক্রমণের তোড়ের সামনে দাঁড়াতে না-পেরে ঘনাদা তাঁর অত সম্মানের আর শখের কেদারায় এবার যেন অসহায়ভাবে বসে পড়েছেন।

গৌর তাতে থামেনি। নির্মমভাবে বলে গিয়েছে, "দুনিয়ার সত্যি-কার অবস্থাটা কী, তা আপনার জানা আছে? তেল আর মাত্র পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ বিলিয়ন ব্যারেল, আর মাত্র ছশো বিলিয়ন টন কয়লা পৃথিবীর এখন সম্বল!"

"হ্যাঁ," বেশ একটু অপরাধীর মতো স্বীকার করেছেন ঘনাদা, "তেল তো আছে মাত্র তিন হাজার সাতশ চল্লিশ বি-টি-ইউ! এম-বি-ডি-ও-ই যা বাড়ছে, বছর দশেকের মধ্যেই তো দুশো ছাড়িয়ে যাবে!"

বি-টি-ইউ! এম-বি-ডি-ও-ই! এসব কী বলছেন ঘনাদা! অন্য সময় হলে এরকম দুটো বুকনিতেই বেশ কাত হয়ে পড়তাম সবাই।

কিন্তু আজ মেজাজ যে পর্দায় বাঁধা, তাতে এসব ভড়কিতে আর আমরা ভোলবার পাত্র নই।

তাই, গলাটা আরও কড়া করে, প্রায় ধমক দিয়েই উঠলাম, "রাখুন আপনার ওসব গুলটুল!"

তারপর পল্টুবাবুকে দেখিয়ে বললাম, "দুনিয়ার হিসেব ছেড়ে দিয়ে এই ভদ্রলোকের কথা একটু ভেবে দেখেছেন? ভদ্রলোক নিজে থেকে খাতির করে আপনাকে তার গাড়িটা চড়তে দিলেন। ভদ্রলোকের নিজের গাড়ি নয়, তাঁর কোম্পানির খরিদ্দারদের দেখাবার জন্য তিনি সেটা এখানে-সেখানে নিয়ে যান! সেই গাড়ি তাঁর পিসতুতো ভাই শিবুকে আর সেই সঙ্গে আমাদের একটু দেখাবার আর চড়াবার জন্যে তিনি তেলের এই আকালের দিনে ট্যাঙ্ক-ভর্তি করে এনেছিলেন। আপনার অনুরোধে দু'পা যাবার জন্যে আপনাকে সে-গাড়ি উনি একটু চড়তে দিয়েছিলেন মাত্র। আপনি··· আপনি সেই গাড়ি নিজের খুশিমতো পুরো পাঁচ ঘণ্টা কোথায় না কোথায় চালিয়ে সমস্ত তেল খরচ করে শেষে রাস্তার লোক দিয়ে ঠেলিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন! ভদ্রলোকের ওপর কী অন্যায় যে করছেন, সে-কথা একবার মনে হল না!"

প্রসিকিউশনটা ভালই করেছি নিশ্চয়। অন্যেরা একটু উশখুশ করলেও ঘনাদা সারাক্ষণ একেবারে চুপ। আমার কথা শেষ হবার পর বেশ একটু যেন শুক্‌নো গলাতেই বললেন, "না, পল্টুবাবুর ওপর খুবই অন্যায় অত্যাচার হয়েছে, ট্যাঙ্কে গ্যালন কুড়ি তেল ছিল নিশ্চয়!"

"না, না, কুড়ি নয়," পল্টুবাবু বিনীতভাবে জানালেন, "আট-ন গ্যালনের বেশি নয়।"

"ও একই কথা!" ঘনাদা নিজের অপরাধের গ্লানিতেই বোধহয়

উদার না হয়ে পারলেন না, "আট-ন গ্যালন তো আর কম তেল নয়, বিশেষ আজকের বাজারে। এ-লোকসান আপনার হবে কেন? দাঁড়ান, দাঁড়ান।"

আমরা এবার বেশ একটু হতভম্ব।

ঘনাদা বলছেন কী? আর জামার এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে খুঁজছেনই বা কী? ভাবখানা তো পকেট থেকে বার করে তখুনি যেন নগদানগদি পল্টুবাবুব তেলের দামটা দিয়ে ফেলে সব ঝামেলা চুকিয়ে দেবার মতো। কিন্তু পকেটে ওঁর বকেয়া সেলাই ছাড়া আর কিছু কখনও থাকে না। আজ তাহলে এত খোঁজাখুঁজি কিসের?

খোঁজাখুঁজিতে কিছু অবশ্য পাওয়া গেল না। ঘনাদা কিন্তু তাতে যেন বেশ একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, "না, কোথায় যে ফেললাম! তেল ফুরিয়ে যাবার ওই ঝামেলার মধ্যেই কোথায় পড়ে গেছে বোধহয়! এখন একটা সাদা কাগজ দিতে পারো?"

হাসব, না জ্বলে উঠব, তখন আমরা বুঝতে পারছি না। কাগজ খুঁজে নিয়ে ঘনাদাব হাতে দেবাব মতো অবস্থা সুতরাং আমাদের তখন নয়। তবে আমাদেব আগেই পল্টুবাবু তাঁর পকেট থেকে নোটবই বার করে তাব একটা পাতা ছিঁড়ে ঘনাদাকে এগিয়ে দিলেন।

ততক্ষণে আমাদের মুখে কথা ফুটল, "কী খুঁজছিলেন আপনি, ঘনাদা? কী হাবিয়েছে? টাকা?"

"না, না, টাকা নয়!" ঘনাদা যেন টাকার কথায় অপমান বোধ করে বললেন, "হারিয়েছে দু'ব্যারীর সই-করা ছাপা কাগজের ছোট একটা খাতা। যাক, এতেই হবে।"

ঘনাদা কলমটাও পল্টুবাবুর কাছে ধার নিয়ে খস্‌খস্‌ করে কী লিখে কাগজটা আর কলমটা পল্টুবাবুকে ফিরিয়ে দিয়ে একটু স্নেহের

হাসি টেনে বললেন, "যত্ন করে রেখে দেবেন!"

যত্ন করে রেখে দেওয়ার মতো কাগজের চিরকুটটা এবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে পল্টুবাবুর হাত থেকে টেনে নিয়ে দেখতেই হল।

দেখে সত্যিই মাথায় চরকিপাক!

কাগজটার ওপরের কটা অক্ষরের নীচে ঘনাদার একটা সই। ঘনাদার সইটাকে বোঝা মহেঞ্জোদরোলিপির পাঠোদ্ধারের চেয়ে শক্ত হতে পারে, কিন্তু তার ওপর তাঁর অদ্বিতীয় হস্তাক্ষরে এ-সব তিনি কী লিখেছেন? লেখাগুলোর ছিরি যাই হোক সেগুলো পড়া যায়।

ঘনাদা ওপরে বড় বড় অক্ষরে ইংরেজিতে ই, ইউ, ডব্লিউ, সি লিখে তার নীচে লিখেছেন পাঁচ এম-বি-ডি-ও-ই এক বছর।

'এম-বি-ডি-ও-ই' শব্দটা তাঁর মুখে খানিক আগেই শুনেছি, ই-ইউ-ডব্লিউ-সি-টা নতুন। কিন্তু কী মানে এই হিং-টিং-ছটের?

ঘনাদা কি ভেবেছেন, এই বুজরুকি দিয়েই আজ আমাদের কাত করে দিয়ে যাবেন? আজ আর সেটি হচ্ছে না। নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে নিয়ে অবরোধটা একটু নরম করেই শুরু করলাম।

বললাম, "এই চিরকুটটা পল্টুবাবুকে রেখে দিতে বলছেন যত্ন করে? এতে তাঁর আট-ন গ্যালনের শোক তিনি ভুলতে পারবেন? তাঁর সব লোকসান পুষিয়ে যাবে?"

"তা যাবে বই কী!" ঘনাদা যেন আমাদের সরল বিশ্বাসের অভাবে বেশ ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, "অনেক অনেক গুণ যাতে পুষিয়ে যায়, সেইমতোই লিখে দিয়েছি।"

"আপনার অশেষ দয়া!" আমাদের গলায় এবার স্টেনলেস স্টীল ব্লেডের ধার, "তা পল্টুবাবুর সব লোকসান ওই চিরকুটেই পুষিয়ে যাবে কেমন করে, তা একটু জানতে পারি? হিজিবিজি কী সাপের মন্তর

লিখেছেন ওই চিরকুটে ?”

„সাপের মন্তরও নয়, হিজিবিজিও না!” ঘনাদা যেন ধৈর্যের অবতার হয়ে উঠেছেন হঠাৎ, “লেখাগুলো পড়তে পারনি বুঝি ?”

“না, পেরেছি!” অসাধ্যসাধনের গর্ব নিয়েই বললাম, “অক্ষরগুলো ইংরেজিতেই লিখতে চেয়েছিলেন মনে হচ্ছে! কিন্তু মানে কী ওই ই-ইউ-ডব্লিউ-সি, আর এম-বি-ডি-ও-ই’র ? ও কোথাকার হিং-টিং-ছট ?”

“হিং-টিং-ছট নয়, শুধু কটা আদ্যক্ষর,” গভীর সহানুভূতি দেখালেন ঘনাদা, “তবে তোমাদের কাছে অক্ষরগুলো ধাঁধার মতোই লাগবার কথা। ওই ই-ইউ-ডব্লিউ-সি’র মানে এনার্জি আনলিমিটেড ওয়ার্লড কার্টেল। অর্থাৎ অফুরন্ত শক্তির বিশ্বসঙ্ঘ। এ নামটা নতুন সাজানো। তবে এম-বি-ডি-ও-ই শক্তি-বিজ্ঞানীদের মহলে পুরনো আধুলির মতো সর্বত্র চালু। অক্ষরগুলোর জট ছাড়ালে কথাটা দাঁড়ায়, মিলিয়ন ব্যারেলস ডেইলি অব অয়েল ইকুইভ্যালেণ্ট। মানে, প্রতিদিন দশ লক্ষ পিপে তেল বা তারই সমান কাজ দেবার মতো যে-কোন বদলি বস্তুর যোগান!”

“কী বললেন ?” আমাদের গলাগুলো একটু ধরা-ধরা। “প্রতিদিন দশ লক্ষ পিপে তেল বা তার বদলি কিছু যোগান দেওয়া! এই এত যোগান দিচ্ছে কে ?”

“দিচ্ছি আমরাই,” ঘনাদা দুঃখের সঙ্গে জানালেন, “উনিশশো তিয়াত্তরে আরবরা তেলের দাম আকাশে তুলে দিয়েছে। হাহাকার পড়ে গেছে চারদিকে, তা সত্ত্বেও রুশ দেশ ছাড়াই বাকি দুনিয়া দিনে একাশিরও বেশি এম-বি-ডি-ও-ই খরচ করেছে। ওদের পণ্ডিতরা বলছে, বছর কুড়ি বাদে ওই একাশি দুশোয় পৌঁছবে।”

"কাজটা ওদের খুব অন্যায় তো তাহলে?" আমরা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"তেলের দিক দিয়ে ওদের যা ভাঁড়ে মা ভবানী অবস্থা, তাতে অন্যায় বই কী।" বলে সায় দিলেন ঘনাদা।

আর সেই মওকাতেই তাঁকে চেপে ধরলাম। তাঁরই চিরকুটটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "কিন্তু এটা আপনি কী লিখে দিয়েছেন পল্টুবাবুকে?" এটা তো তেলের হ্যাণ্ডনোট বলেই মনে হচ্ছে। পল্টুবাবুকে এক বছর প্রতিদিন পাঁচ এম-বি-ডি-ও-ই দেওয়া হবে, সেইরকমই কি এতে লেখা না? না আমাদের ভুলই হয়েছে পড়তে?"

এবার ঘনাদাকে যে মোক্ষম প্যাঁচে ফেলেছি তাতে নির্ঘাত কুপোকাত! তাঁর নিজের হাতে সদ্য লিখে দেওয়া চিরকুট! এ ফাঁদ থেকে বার হবেন কী করে? নিজের হাতের লেখা আর মুখের ব্যাখ্যা হট্‌জলদি বদলে দেবার চেষ্টা করবেন? তাহলে ফাঁস টানব আরও জম্পেশ করে। অবস্থাটা কত বেগতিক, তা বুঝেই বোধহয় ঘনাদা সে দিক দিয়েই গেলেন না। চিরকুটের লেখাটার মানে বদলে দেবার চেষ্টা না করে একেবারে উল্টো সুর ধরলেন।

আমাদের সন্দেহেই যেন অবাক হয়ে বললেন, "পড়তে ভুল হবে কেন? ঠিকই পড়েছ। আর তেলের হ্যাণ্ডনোট ধরে নিয়ে ও চিরকুটের কড়ারের বহর দেখে যদি অবাক হয়ে থাকো, তাহলে জেনে রাখো যে, ও হ্যাণ্ডনোট জেনেশুনে বুঝেসুঝেই লিখেছি। সত্যি কথা বলতে গেলে পল্টুবাবুর ঋণ ওতেও পুরো শোধ হবে না।"

"তাই নাকি!" আমরা গলার সুরটা যথাসম্ভব সরল রেখেই বললাম, "ওই আট-ন গ্যালনের ঋণ?"

"হ্যাঁ, ওই আট-ন গ্যালন!" ঘনাদা একেবারে গদগদ হলেন,

"ওই আট-ন গ্যালন আর পল্টুবাবুর গাড়িটা না থাকলে ই-ইউ-ডব্লিউ-সি নামটাই হয়ত পৃথিবীতে অজানা থেকে যেত। তার জায়গায় 'এস-এস-পি-এস'-এর মালিকদেরই আমরা গোলামি করতাম সারা দুনিয়ায়। এত বড় উপকারের জন্যে দিনে পাঁচ এম-বি-ডি-ও-ই লিখে দেওয়া কি বেশি কিছু হয়েছে?"

এস-এস-পি-এস, এম-বি-ডি-ও-ই, ই-ইউ-ডব্লিউ-সি। তার মানে বেড়াজাল কেটে বেরোবার রাস্তা না পেয়ে ঘনাদা ওই সব আবোল তাবোল প্রলাপ বকে আমাদের মাথায় ঘোর লাগাবার চেষ্টা করছেন। উহুঁ সেটি আর হচ্ছে না।

বললাম, "বেশ কাজের মতো কাজই করেছেন! কিন্তু এত যে সব ভেল্কিবাজি হয়ে গেল, সবই তো সাতসকালে পল্টুবাবুর আট-ন গ্যালন তেল ভরে আনা গাড়িটির জন্যে। সেটি আজ আপনার হাতে না পড়লে দুনিয়ার মস্ত লোকসান হয়ে যেত তাহলে?"

"হ্যাঁ, হত।" ঘনাদা এতক্ষণের মধুর ভাব ছেড়ে হঠাৎ যেন গর্জন করে উঠলেন, "ও গাড়িতে চড়ে না বেরুলে গড়িয়াহাটের মোড়ের ওই বিশ্রী ট্রাফিক জ্যামে পড়তাম না। সেই ট্রাফিক জ্যামে না পড়লে পাশের জানলা-তোলা একটা বিদেশী 'সেডান'-এর ভেতর থেকে ক'টা কথা কানে গিয়ে চমকে উঠতাম না। তারপর সেই গাড়ির পেছনে ধাওয়া করে অর্ধেক কলকাতা ঘুরে শেষ পর্যন্ত এয়ারপোর্ট হোটেলে গিয়ে আসল পালের গোদার দেখা পেতাম না। আর তার দেখা তখন না পেলে এতক্ষণে ব্যাংককের পথে মালয়ের ওপর একটা অপ্রত্যাশিত বিমান দুর্ঘটনার খবর নিশ্চয়ই বেতারে ছড়িয়ে পড়ত। যাক, এর বেশি আর কিছু বলার নেই এখন। বারোটাও বেজে গেছে। এখন ওঠাই ভাল।"

ঘনাদা কেদারা ছেড়ে ওঠার উপক্রম করলেন। কিন্তু তার আগেই বাইরের দরজা আগলে আমরা জবরদস্ত ভাবে খাড়া।

আমাদের ভঙ্গিগুলো মিলিটারি হলেও আওয়াজ তখনো খুব নরম। বললাম, "এখন উঠছেন কী? ছুটির দিনে বারোটা আবার বেলা। রামভুজ এখনো চিতল মাছের ধোঁকা চড়ায়ওনি বোধহয়। বলুন, বলুন। পল্টুবাবুর গাড়িতে না-চড়লে যে ট্রাফিক জ্যামে পড়তেন না, সেই ট্রাফিক জ্যামে পাশের বন্ধ মোটর থেকে চমকে দেওয়ার মতো কী শুনলেন সেইটা বলুন।"

"সেইটে শুনতে চাও?" ঘনাদা একটু অনুকম্পার হাসি হেসেই বললেন, "কিন্তু তা শুনলে তো বুঝতে পারবে না!"

"বুঝতে পারব না!" আমরা একটু অপমানিত, "কেন কোন্ দেশের ভাষা?"

"ভাষা ইউরোপেরই।" ঘনাদা ব্যাখ্যা করলেন, "তবে ইউরোপেরও খুব কম লোকই এ-ভাষায় কথা কয় বা জানে। ভাষাটা হল 'বাস্‌ক্‌'। স্পেনের উত্তর পশ্চিমের একটা ছোট অঞ্চলের এ ভাষা···"

"থাক থাক, ওতেই হবে," ঘনাদাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "ভাষাটা আপনার তো জানা। আপনি কী শুনে কী বুঝলেন তাই বলুন।"

"আমি যা শুনলাম, আর যা বুঝলাম, তাও তো তোমাদের কাছে ধাঁধা।" ঘনাদা তাঁর কথায় বাধা দেবার শোধ তুলে বললেন, "কথা যা শুনলাম তা 'এনজেল' নিয়ে। এনজেল মানে বোঝো কি?"

"বুঝব না কেন?" আমরা তাচ্ছিল্যভবে বললাম, "এনজেল মানে দেবদূত, তা কে না জানে!"

"না, এ সে-এনজেল নয়।" ঘনাদা বুঝিয়ে দিলেন, "এ হল আকাশে প্লেন কি রকেটের ওড়ার উচ্চতার মাপ। এক এনজেল প্রায় তিনশো পাঁচ মিটার। তবে শুধু এনজেল কি বাস্‌ক্‌ ভাষা শুনেই আমি চমকে উঠিনি। আমি রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেছি গলার স্বরটায়। 'বাস্‌ক্‌' ভাষার সঙ্গে, এ-গলা তো দুনিয়ার একটি মাত্র লোককেই নির্ভুলভাবে চিনিয়ে দেয়। ট্রাফিক জ্যাম কেটে গিয়ে আবার গাড়িগুলো সচল হবার মধ্যে আরও ক'টা কথা শুনে আমি তখন নিশ্চিতভাবে বুঝেছি আমার পাশের জানলা-বন্ধ দামি বিদেশী সেডান গাড়িটার ভেতরে বোরোত্রা ছাড়া আর কেউ নেই। বোরোত্রা অবশ্য তার আসল নাম নয়। তারই দেশের অনেক আগেকার এক মস্ত টেনিস খেলোয়াড়ের ওই নামটা সে ছদ্মনাম হিসেবে ব্যবহার করে।

"কিন্তু বোরোত্রা হঠাৎ দুনিয়ার সব জায়গা ছেড়ে কলকাতা হেন

শহরের রাসবিহারী অ্যাভেনিউর মতো রাস্তায় কেন? বোরোত্রা মানেই তো চরম শয়তানি, সর্বনাশা কিছু! এখানে সেরকম কী মতলবে সে এসেছে!

"ট্রাফিক জ্যামটা কাটবার ঠিক আগের মুহূর্তে একটা উচ্চারণে ভয়ঙ্কর রহস্যটার আসল খেই পেয়ে গেলাম। বন্ধ গাড়িটার ভেতর থেকে একটা নামই শুধু চকিতে কানে এল। দু'ব্যারী! তারপরই গাড়িটা বিদ্যুৎবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল সামনে।

"বিদেশী দামি গাড়ির যেমন পিক্ আপ, তেমনি বেগ। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেছনে লেগে থাকা কি সোজা কথা! তবু বোরোত্রাকে চোখের আড়াল হতে দিলে আমার চলবে না। যেমন করে হোক তার পেছনে আঠার মতো লেগে থাকতে হবেই।

"কলকাতার ঘিঞ্জি সব রাস্তার ভিড় আর যানবাহনের অব্যবস্থা আমার সহায় না হলে বোরোত্রার পেছনে লেগে থাকা আমার সম্ভব হত না। তার পেছনে কেউ লেগে আছে তা আন্দাজ করে অথবা নিজের স্বাভাবিক সাবধানতায় বোরোত্রা তার গাড়িটাকে কলকাতার ভেতরে উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম দিকে তখন যেন চরকি পাক খাওয়াচ্ছে। ড্রাইভারকে যেমন করে হোক তাকে চোখের আড়াল না-হতে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে আমি তখন কৌতূহল ভাবনা উদ্বেগে অস্থির হয়ে বসে আছি।

"বোরোত্রার সঙ্গে প্রথম দেখার কথাটা তো ভোলবার নয়। বোরোত্রার সঙ্গে দেখা হওয়ার কারণটা হয়েছে অবশ্য সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য একজন।

"মাত্র বছরখানেক আগে হঠাৎ নিজেদের তেলের খনিগুলোর মধ্যে সারা দুনিয়াকে খুশিমতো ওঠবোস করাবার কী ক্ষমতা যে আছে, তা

বুঝে আরব দেশগুলো পেট্রোলের দাম একেবারে আকাশ-ছোঁয়া করে দিয়েছে। পৃথিবীর আমির-ওমরাহ দেশগুলোই তাতে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে পথে বসে পড়েছে। দিনকাল বদলেছে। নইলে আরব দেশগুলোর মতো সামান্য ক্ষমতার কোনো রাজ্য আগেকার দিনে এরকম বেয়াদবি করলে গ্রেট ব্রিটেন দেখতে-না-দেখতে তিনটে ম্যান অব ওয়ার পারস্য উপসাগরে পাঠিয়ে সব ঠাণ্ডা করে দিত। এখনও বড়-বড় শক্তিগুলোর একটা ছুতো করে, পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে দুটো এয়ারক্র্যাফট কেরিয়ার অকুস্থলে রওনা করিয়ে দিয়ে, গোটা পাঁচেক বড় বম্বার সেখানকার আকাশে ক'বার একটু ঘুরিয়ে বেয়াড়াদের সিধে করে দিতে কি ইচ্ছে করে না? কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, সেদিন আর নেই। এক দলের এয়ারক্র্যাফ্‌ট কেরিয়ার সেখানে দেখা দিতে-না-দিতেই আরেক নিশান-ওড়ানো কেরিয়ারকে কাছাকাছি টহল দিতে দেখা যাবে নিশ্চয়। একজনের বোমারু বিমান কিছু বাড়াবাড়ি করলে আরেকজনের অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট কামান এখান-সেখান থেকে হঠাৎ হয়ত উঁকি দিতে শুরু করবে।

"ও সব পুরনো চাল ছেড়ে মার-খাওয়া পালের গোদাগুলো তাই তখন মুশকিল আসানের ভিন্ন উপায় খুঁজছে।

"সব বড়-বড় দেশগুলোয় তখন অমন গণ্ডা-গণ্ডা লুকনো আর দেখানো সঙ্কট-মোচনের রাস্তা বার করবার ঘাঁটি।

"ন্যু-ইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, বন, মাদ্রিদ, অসলো, স্টকহোলম্‌ তো বটেই, লিমা, ব্রাসিলিয়া, বুয়েনস এয়ারসে পর্যন্ত কোটি কোটি টাকা অকাতরে খরচ করে দুনিয়ার সব বাঘা-বাঘা ওই লাইনের বৈজ্ঞানিকদের জড় করা হয়েছে তেলের বদলি এনার্জি যোগাবার নতুন কিছু আবিষ্কারের জন্যে।

"নদীর স্রোতের তোড়, হাওয়ার বেগ, সমুদ্রের ঢেউয়ের নিত্য ঝাঁপিয়ে আসা আর ফিরে যাওয়া থেকে সূর্যের তাপ আর পরমাণু বিস্ফোরণ পর্যন্ত অনেক কিছুর ভেতরেই অফুরন্ত শক্তির উৎস সন্ধানের চেষ্টা হচ্ছে।

"নানা দেশের রাজশক্তির সরকারি সাহায্য আর উৎসাহ এ-সব চেষ্টার পেছনে অল্পবিস্তর থাকলেও দুনিয়ার কুবেরমার্কা কারবারিরাই নিজেদের স্বার্থে জোট বেঁধে এ-কাজ হাসিলের জন্যে মুক্তহস্ত হয়েছে।

"তেলের বদলি একটা কিছু সব-দিক-সামলানো সত্যিকার শক্তির উৎস বার করতে খরচায় টান যাতে কোনমতেই না পড়ে, সেইজন্যেই ইউরোপ-আমেরিকার কুবের-কারবারিদের এমন করে জোট বাঁধা।

"সবচেয়ে বড় এ-জোটের নাম এস-এস-পি-এস।

"এক দিক দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বাঘা কারবারি-জোট হলেও এই 'এস-এস-পি-এস'-এর কথা খুব কম লোকেই জানে।

"মন্ত্রগুপ্তির ব্যবস্থা তাদের এত পাকা যে, তারা যে দুনিয়ায় নতুন জমানা আমদানি করার ব্যাপারে প্রায় বাজিমাত করতে চলেছে, এ-খবরটা ঘুণাক্ষরে বড়-বড় দেশের গোয়েন্দা দপ্তরেও পৌঁছয়নি।

"মঁসিয়ে লেভির মুখে এ-নামটা শুনে তাই সেদিন সত্যি চমকে উঠেছিলাম।

"পারিসের বেশ একটা গরিব পাড়ার নেহাত শস্তা একটা হোটেলের একেবারে টঙের একটা অখদ্যে ঘর নিয়ে তখন থাকি।*

"হোটেলটার এমন অবস্থা যে, নীচের লবির কাউন্টার থেকে বোর্ডারদের কামরায় ফোনের ব্যবস্থাও নেই। বোর্ডারদের কাউকে কোনো খবর দেবার দরকার হলে নীচের জ্যানিটরকেই সেটা দিতে আসতে হয়।

Hotel
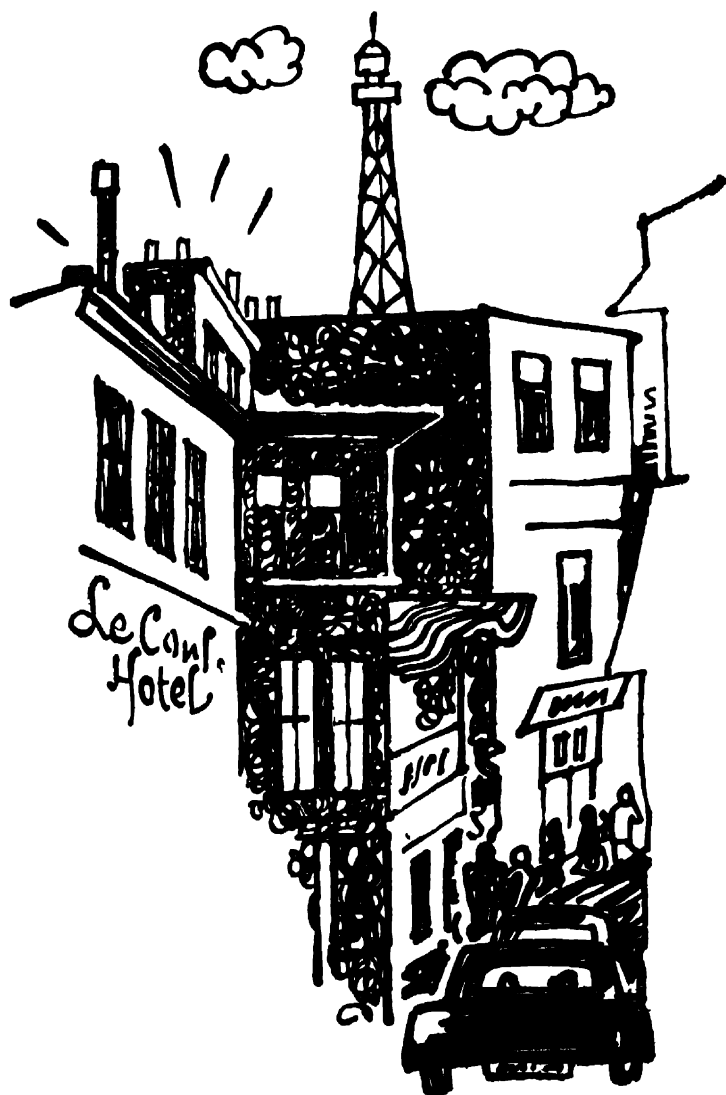
"আমার কামরা চারতলার টঙে। সবচেয়ে শস্তা বলে এই গ্যারেট-ঘরটাই নিয়েছি।

"চার-চারটে তলার সিঁড়ি ভেঙে এসে হোটেলেব বুড়ো জ্যানিটর হাঁফাতে-হাঁফাতে যে-খবরটা আমায় দিলে, তাতে আমি প্রথমটা বেশ একটু অস্বস্তিই বোধ করলাম।

"জ্যানিটর খবর এনেছে যে, কে একজন হোটেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

"আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে এ-হোটেলে! মনে-মনেই কথাটা আউড়ে আমি বেশ ভাবনায় পড়লাম।

"আমার সঙ্গে এ-হোটেলে কারুর দেখা করতে আসা তো স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। নিজেকে একটু গোপনে রাখব বলেই খুঁজে-পেতে প্যারিসের সেইন নদীর বাঁ পাড়ের এমন একটা অখদ্যে হোটেলে আমি উঠেছি। নিজের সঠিক নামটাও এখানকার রেজিস্ট্রি খাতায় লিখিনি। পাছে চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাই রাত্রের অন্ধকারে ছাড়া হোটেল থেকে আমি কখনও বার হই না।

"তা সত্ত্বেও এখানে আমার খোঁজ করে দেখা করতে যদি কেউ আসে, তা হলে সেটা তো বেশ সন্দেহজনক ব্যাপার।

"মনের তোলপাড়াগুলো অবশ্য বাইরে বুঝতে না-দিয়ে একটু বিরক্তির সুরেই বলেছি, 'কে আবার এল দেখা করতে। যে এসেছে তাকে ওপরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়নি কেন?'

" 'পাঠাব কী করে?' জ্যানিটর বুড়ো আমার চেয়েও তিরিক্ষি মেজাজে বলেছে, 'তার কি এতখানি সিঁড়ি ভাঙবার ক্ষমতা আছে! নীচে এসে যেরকম ধুঁকছে, তাতে আমাদের হোটেল থেকেই না অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হয়।'

"একটু থেমে নীচে যাবার সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে বুড়ো জ্যানিটর তারপর যেতে যেতে বলেছে, 'আমার খবর দেবার দিলাম। তোমার যা করবার করো।'

"মনে মনে তখন বুঝেছি, নীচে যে-ই এসে থাক, তার সঙ্গে দেখা করতে না-গিয়ে আমার উপায় নেই।

"জ্যানিটর বুড়ো চলে যাবার পর প্রায় তার পিছু-পিছুই তাই সিঁড়ি দিয়ে নেমেছি নীচের লবিতে।

"যেমন হোটেল তেমনি তার লবি। বসবার চেয়ার সোফা-টোফাগুলি ভাঙাচোরা, ছেঁড়া-খোঁড়া, কাউন্টারের কাঠের তক্তার পালিশ-টালিশ কবে উঠে গিয়ে একটা উইয়ে-খাওয়া চেহারা। সমস্ত হোটেলটাই যেন কোন পুরনো রদ্দি মালের নিলেমের হাট থেকে কিনে এনে বসানো হয়েছে।

"হোটেল যেমনই হোক, তার কাউন্টারের ক্লার্ক কিন্তু চটপটে, মোটামুটি ফিটফাট এক ফাজিল ছোকরা।

"আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে লবিতে কাউকে দেখতে না-পেয়ে কাউন্টারের দিকে খোঁজ করতে যেতেই ঠাট্টা করে বললে, 'আপনার সঙ্গে স্বয়ং মিথুজেলা দেখা করতে এসেছেন।'

"রসিকতাটা গ্রাহ্য না করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় তিনি?'

"ফাজিল ছোকরা রসিকতার সুরেই বললে, 'খোদ মিথুজেলা তো! সিঁড়ি ভেঙে ওপরে যাবার ক্ষমতা নেই, আবার লবিতেও সকলের সামনে বসে থাকতে চান না। একটু নিরিবিলিতে অপেক্ষা করতে চাইলেন বলে সিঁড়ির নীচের কোণে ওই জ্যানিটরের জায়গায় বসিয়ে দিয়েছি। যা অবস্থা! দেখুন এতক্ষণ টিঁকে আছেন কিনা।'

"ছোকরার শেষ রসিকতাটা মুখ থেকে বার হবার আগেই সিঁড়ির

পেছনের কোণে জ্যানিটরের বসবার জায়গায় একটু ব্যস্ত হয়েই ছুটে যাবার ইচ্ছে হলেও সে-ইচ্ছেটা চেপে বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বললাম, 'মিথুজেলাই হোক আর যেই হোক, আমার খোঁজে এসেছে বলছ কী করে? নাম বলেছে আমার?'

"এবার ক্লার্ক ছোকরা একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর একটু সামলে কৈফিয়তস্বরূপ জানালে, 'না, নাম আপনার বলেননি। তবে কাউন্টারে এসে আপনার চেহারা পোশাকের বর্ণনা দিয়ে খোঁজ করাতে আমি ভাবলাম...'

" 'তোমার শুধু চুল ছাঁটাবার মাথা। ভাববার জন্যে নয়।' বলে ফাজিল ছোকরাকে বেশ একটু হতভম্ব করে সিঁড়ির পেছনের কোণে গিয়ে কিন্তু সত্যি অবাক আর স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

"সেখানে জ্যানিটরের চেয়ারটায় প্রায় যেন ভেঙে-পড়া অবস্থায় যে মানুষটা বসে আছে তাকে চিনতে পারিনি এমন নয়। একমুখ দাড়িগোঁফ সমেত চেহারায় অমন অবিশ্বাস্য পরিবর্তন সত্ত্বেও সে যে মঁসিয়ে লেভি ছাড়া আর কেউ নয় তা বুঝতে আমার কয়েক সেকেণ্ড মাত্র লেগেছে।

"কিন্তু মঁসিয়ে লেভি এমন অবস্থায় আমার কাছে কেন? আমার খোঁজই বা সে পেল কী করে! আর আমার এখন তার বিষয়ে কী করা উচিত?

"এই কটা প্রশ্ন মনের ভেতর ওঠবার মধ্যেই লেভি কোনোরকমে ঘাড়টা তুলে আমার দিকে তাকাল।

"তার সেই ক্লান্ত কোটরে-বসা-চোখের চাউনি যেন মড়ার চোখের দৃষ্টি।

"আমার দিকে সেইভাবেই কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে সে বললে,

'দাস, তোমায়···'

"আমার এবার কী করা উচিত তা এইটুকুর মধ্যে আমি ঠিক করে নিয়েছি।

"লেভিকে তার কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কড়া গলায় বললাম, 'কাকে কি বলছেন আপনি? দাস বলছেন কাকে? আমি দাস নই! মিছিমিছি কেন আমাকে ডাকিয়ে নামিয়েছেন?'

"লেভির মুখচোখের চেহারা দেখে তখন কষ্ট হচ্ছে। কেমন হতাশ-ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলেছে, 'তুমি—আপনি দাস নন?'

" 'না, আমি দাস নই। আমার নাম লোপেজ গঞ্জালেস। হোটেলের কাউন্টারে জিজ্ঞাসা করলেই আমার নাম জানতে পারতেন···'

"বেশ গলা চড়িয়ে লেভিকে এ-সব কথা শোনাবার মধ্যে একটা চোখ কয়েকবার মটকে তাকে ইশারা করবার চেষ্টা করেছি।

"লেভির চোখের দৃষ্টিই হয়তো ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে বলে সে সে-ইশারা বুঝেছে বলে মনে হয়নি।

"তার ওপর ফরাসিতে চড়া গলায় তম্বি করার মধ্যে তাই এবার একবারের জন্যে গলাটা একেবারে নামিয়ে তুর্কি ভাষায় একটা কথা শুধু বলেছি। ফ্রান্সের লোক হলেও লেভি যে বহুকাল তুরস্কেই কাটিয়েছে আর সেখানকার ভাষা যে ওর প্রায় মাতৃভাষার মতো তা জেনে চড়া গলার গালাগালির মধ্যে ছোট্ট করে শুধু তুর্কিতে একবার বলেছি, 'এটা নাটক।'

"মুখের তোড়টা অবশ্য আগে পরে সমানে চালিয়ে গেছি। বলে গেছি, 'আসলে কে আপনি, কী মতলবে এখানে এসেছেন ঠিক করে বলুন। আজগুবি একজনের নাম বলে এখানে খুঁজতে আসার ছল করে

ঢোকার নিশ্চয় একটা কোনো উদ্দেশ্য আছে।—ভয় নেই! এটা নাটক! —আপনার পাকা চুলদাড়ি দেখে ভুলব ভাববেন না। ও-সব চালাকি আমার অনেক জানা আছে।

"চোখের ইশারায় যা হয়নি, আমার তম্বির মধ্যে ওই তুর্কি কথাটুকুতেই তা হাসিল হয়েছে। ক্লান্ত দুর্বল গলাতে হলেও লেভি এবার ব্যাপারটা বুঝে নিজেও যথাসাধ্য অভিনয় করবার চেষ্টা করেছে।

"চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বলেছে, 'না, না, আমারই ভুল হয়েছে এখানে আসা। আমায় মাপ করবেন। আমি— আমি চলে যাচ্ছি।'

"কিন্তু চলে যাবে কী, উঠতে গিয়েই লেভি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার যোগাড়।

"কোনোরকমে তাকে ধরে ফেলে এবার বাধ্য হয়ে সুর পাল্টাতে হয়েছে।

"যেন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছি, 'আরে আপনি হাঁটতে গিয়ে টলে পড়ছেন যে! নেশায় চুর হয়ে এসেছেন বুঝি? অবস্থা যা দেখছি তাতে এই হোটেলের মধ্যেই দাঁত ছিরকুটে পড়ে একটা কেলেঙ্কারি বাধাবেন। চলুন, চলুন, আপনাকে বার করে দিয়ে আসি। আরে না না, ও সামনের দরজা দিয়ে নয়। ওখানে কেউ আপনার এ-চেহারা দেখলে এ-হোটেলের বদনাম হয়ে যাবে। এদিকে এই খিড়কি দিয়ে আসুন…'

"এইসব বোলচাল দিতে দিতে লেভিকে ধরে হোটেলের পেছনের দিকের একটা খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে নিরাপদ বলে সেইন নদীর ধারে ওখানকার মালটাল-বওয়া লঞ্চ, টাগ-বোটের মাঝিমাল্লাদের একটা কফিখানায় গিয়ে উঠেছি।

"সেখানে লেভির এমন হাল কী করে হল জানতে চাওয়ায় তার মুখে 'এস-এস-পি-এস' শুনে অবাক হয়েছি।

"জিজ্ঞাসা করেছি, 'এস-এস-পি-এস! এ নাম তুমি কোথা থেকে জানলে? কী জানো তুমি এস-এস-পি-এস সম্বন্ধে?'

" 'যা জানবার সবই জানি,' হতাশ ভাবে বলেছে লেভি, 'আমার এখন এ-হাল হয়েছে ওই 'এস-এস-পি-এস'-এরই জন্যে।'

" 'এস-এস-পি-এস-এর জন্যে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, 'তা হলে ওদের সঙ্গে তুমি জড়িত ছিলে?'

" 'হ্যাঁ ছিলাম,' ক্লান্তভাবে বলেছে লেভি, 'কিন্তু ওরা কারা, কী ওদের কাজ, তুমি নিজে কিছু জানো?'

" 'তা একটু জানি বই কী,' তিক্ত স্বরেই বলেছি, 'আর কিছু অন্তত না-জানলে আর আরো-কিছু জানতে না চাইলে এমন করে নাম ভাঁড়িয়ে এরকম একটা জায়গায় লুকিয়ে বসে আছি কেন? কিন্তু তুমি এখানে আমায় খুঁজে বার করলে কী করে?'

" 'নেহাত ভাগ্যের জোরে,' বলে লেভি তার নিজের কাহিনীটা আমায় শুনিয়েছে।

"লেভি কাজটা এতদিন যা করে এসেছে তা প্রাণ-হাতে-নিয়ে-ফেরার মতো পরম দুঃসাহসের হলেও তার একটা দুর্নাম আছে।

"কাজটা গুপ্তচরের। তবে লেভির একটা বিশেষত্ব এই যে, শুধু মোটা ইনামের প্রলোভনে যা সে অন্যায় মনে করে এমন কাজ সে কখনো জেনেশুনে হাতে নেয়নি।

"বাইরে ফ্রান্সের একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে সেলস্‌ম্যানের ভোল্ নিয়ে সে বহুকাল থেকে তুরস্কেই তার গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে।

"এস-এস-পি-এস তার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে গোপনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তেলের বাদশাদের একচেটিয়া মালিকানার জুলুম ব্যর্থ করে পৃথিবীর সব মানুষের জন্যে এনার্জির অন্য উৎস আবিষ্কারই এদের মহৎ উদ্দেশ্য জেনে লেভি এদের হয়ে কাজ করতে রাজি হয়। তেলের বাদশা মালিকরাই তাদের আসল শত্রু বলে বুঝিয়ে তাদের গোপন চক্রান্তের অন্ধি-সন্ধি জানবার জন্যেই লেভিকে যেন লাগানো হয়।

"কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই লেভি এস-এস-পি-এস-এর আসল স্বরূপ জানতে পারে।

" 'কী সে স্বরূপ?' এই পর্যন্ত শুনেই লেভিকে প্রশ্ন করেছি।

" 'তা তুমি এখনো জানো না?' —লেভি একটু রুক্ষ স্বরেই আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল।

"একটু হেসে বলেছিলাম, 'জানি যে, তারা সমস্ত পৃথিবীকে নতুন এক মহাজনী সাম্রাজ্যের ক্রীতদাস করে রাখতে চায়। তুমি এর চেয়ে বেশি কিছু জানো কিনা তাই শুনতে চাচ্ছি।'

" 'হ্যাঁ, বেশি কিছুই জানি,' জ্বলন্ত স্বরে বলেছে লেভি, 'একটা নামই প্রথম বলছি, ই-ইউ-ডব্লিউ-সি। শুনেছ কখনো এ নাম?'

" 'হ্যাঁ, শুনেছি,' এবার একটু নরম গলাতেই বলেছি, 'ও নাম হল, এনার্জি আনলিমিটেড ওয়ার্লড কার্টেল। ওই নামটুকুর বেশি আর কিছুই জানি না সে-কথা অবশ্য স্বীকার করছি।'

" 'বেশ, আমার কাছেই শোনো তাহলে', বলে লেভি এবার 'এস-এস-পি-এস' আর 'ই-ইউ-ডব্লিউ-সি'র সমস্ত রহস্য আমায় বুঝিয়েছে। সে-রহস্য নিজে জানবার পর 'এস-এস-পি-এস'-এর হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করতে রাজি না হওয়ায় কেমনভাবে তাকে তুরস্কের

ইস্তাম্বুল থেকে লোপাট করে কাছের এক ছোট দ্বীপে বন্দী করে রাখা হয়, সেখানে শেষ পর্যন্ত তাকে খতমই করে দেওয়া হবে জেনে কেমন করে সে ভাগ্যক্রমে সেখান থেকে পালায় আর তারপর এসব গোপন রহস্য জানিয়ে যাবার জন্যে নিজে 'এস-এস-পি-এস'-এর ভাড়াটে দুশমনদের হাতে ধরা পড়বার বিপদ সত্ত্বেও কীভাবে তার পুরনো বিশ্বাসী বন্ধুদের খোঁজ করে বেড়ায়, সে-কাহিনী লেভি আমায় শুনিয়েছে।

"আমায় খুঁজে পাওয়াটা নেহাত তার ভাগ্য। প্যারিসের নানা রাস্তায় ছন্নছাড়ার মতো ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে একজনের চেহারা দেখে বেশ ফাঁপরে পড়ে। চেহারাটার সঙ্গে তার এককালের বন্ধু আর সঙ্গী 'দাস'-এর খানিকটা মিল থাকলেও, মানুষটার চলাফেরা পোশাক সবই আলাদা।"

৪

"ও! আপনি বুঝি চলাফেরার কায়দাও বদলে দিয়েছিলেন?" ঘনাদার কথার মাঝখানেই মুগ্ধ গদগদ স্বরে বললে পল্টুবাবু।

"হ্যাঁ, চেনার অসাধ্য করে ভোল পাল্টাতে হলে শুধু চেহারা পোশাকই নয়, হাঁটা, চলা, কথা বলার ধরনও বদলাতে হয়!" ঘনাদা একটু অনুকম্পার হাসির সঙ্গে জ্ঞানটুকু দিতে পেরে খুশি হয়েই আবার বলতে শুরু করলেন, "কিন্তু লেভিও তো গুপ্তচরগিরির বিদ্যায় বড় কম যায় না। গরমিলগুলো সত্ত্বেও সে দূর থেকে আমার পিছু নেয়, আর তারপর আমার হোটেলটার হদিস পেয়ে দেখা করতে আসে মরিয়া হয়েই।

"তার নিজের যে আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই তা সে ভাল করেই জানে। 'এস-এস-পি-এস'-এর কয়েদখানায় তার শরীরের যা হাল হয়েছে তাতে আর ক'দিনই বা সে টিঁকবে! তাছাড়া বেঁচে

থাকলেও যে-তুশমনেরা তার পেছনে লেগে আছে, তারা তাকে ধরে ফেলবেই। আমায় তাই লেভি তার জোগাড়-করা সমস্ত সুলুক-সন্ধান দিয়ে 'ই-ইউ-ডব্লিউ-সি' আর 'এস-এস-পি-এস' সম্বন্ধে যা করবার তাই করতে বলে।

"আমার একটা সুবিধের কথাও সে আমায় জানিয়ে দেয়। 'ই-ইউ-ডব্লিউ-সি'তো বটেই, 'এস-এস-পি-এস'-এর চর আর চাঁইদের কাছেও আমি একেবারে অজানা।

"আমি তাই বেশ চুপিসারে তাদের পেছনে লেগে থেকে নিজের মতলব হাসিল করতে পারব।

"সবশেষে লেভি বলেছে, ই-ইউ ডব্লিউ-সি সম্বন্ধে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে আমার দায়িত্ব যে কী, তা আমায় যে বলে দিতে হবে না, তা সে জানে।

"লেভিকে তারই ভালোর জন্যে মাঝিমাল্লার ওই কফি-খানাতেই রেখে আমি একলা সেখান থেকে চলে এসেছি। সাবধানের মার নেই বলে হোটেলটা থেকেও পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে সরে পড়েছি সেইদিনই।

"তারপর লেভির কাছে পাওয়া সব সুলুক-সন্ধানের খেই ধরে যত জায়গায় ঘুরেছি তা দেখাতে হলে সারা তুনিয়ার ম্যাপটাই খুলে ধরতে হয়।

"সারা তুনিয়া চষে বেড়াবার পর তখন ক'দিনের জন্যে হংকং-এ আছি। কাজ যে কিছু সারতে পারিনি তা নয়, কিন্তু হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যাবেলা যা হয়ে গেল, তা আমার সম্পূর্ণ আশাতীত।

"বিকেলের দিকে সেদিন হংকং-এর সব দ্রষ্টব্যের মধ্যে তুলনাহীন সেই সমুদ্র-পার্কে গিয়েছিলাম। পৃথিবীর কোথাও যা নেই, সামুদ্রিক প্রাণীর সেই বিরাট স্বাভাবিক পরিবেশের সমাবেশে অন্য সব-কিছুর

মধ্যে বিশেষ করে গ্লোরি আর বার্ট নাম দেওয়া দুই ডলফিনের জল থেকে পুরো এক-মানুষ-প্রমাণ লাফ দিয়ে দিয়ে উঠে বল হেড করার বাহাদুরি দেখে বেশ-একটু আমোদ পেয়ে কেবল-কারে চড়ে বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে উঠে বসতে গিয়ে তাজ্জব হয়ে গেছি।

"ট্যাক্সির দরজাটা খুলে সবে ভেতরে উঠে বসেছি, এমন সময় অন্যদিক থেকে একটা রোগাটে হাঘরে চেহারা ও পোশাকেব মানুষ যেন চোরের মতো ছুটে এসে অন্য দিক দিয়ে আমার ট্যাক্সিটায় উঠে পড়ে কাতর মিনতি করে বলল, 'দোহাই আপনার, যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানেই চালাতে বলুন।'

"মিনতিটা ফরাসিতে করা। ট্যাক্সিতে চীনে ড্রাইভার ফরাসি বুঝুক না-বুঝুক এ-উপদ্রবে রেগে উঠে তার নিজের ভাষায় আর পিজিন ইংরেজিতে লোকটাকে নেমে যাবার জন্যে ধমক দিলে।

"আমার দিকে করুণভাবে চেয়ে লোকটা নেমে যেতেই উঠছিল। কিন্তু আমি বাধা দিয়ে তাকে থামিয়ে ড্রাইভারকে আমার হোটেলের ঠিকানায় চালাতে বললাম।

"হোটেল পর্যন্ত পৌঁছবার পর লোকটা নেমে চলে যাবে ভেবেছিলাম। তা গেলে তাকে বাধা দিতেও পারতাম না। কিন্তু তা সে গেল না। আমি লবি থেকে অটোমেটিক লিফটে গিয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে তার সেই আধময়লা ছেঁড়া হ্যাভারস্যাক নিয়ে সুড়ুত করে ঢুকে পড়ে আমার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

"পাঁচতলায় আমার কামরা। সেখানকার ল্যাণ্ডিংয়ে নামবার পরেও দেখি, সে আমার সঙ্গ ছাড়ছে না। আমার কামরা সতেরো নম্বর। সে-কামরায় যাবার প্যাসেজে তখন কোনো লোক নেই।

"আমার কামরার সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় চাবি লাগাতে-

লাগাতে তার দিকে ফিরে বললাম, 'আমি কিন্তু এবার আমার কামরায় যাচ্ছি।'

"দয়া করে আমাকে তাহলে আজকে রাত্রের মতো এখানে থাকতে দিন।' লোকটা আতঙ্ক-মেশানো চাপা গলায় বললে, 'আমি মেঝের কার্পেটের ওপর শুয়ে থাকব। আপনার এতটুকু অসুবিধে করব না। আর কাল ভোর হবার আগেই এখান থেকে পালিয়ে যাব।'

"একটু বাঁকা ঠোঁটে হেসে কামরার দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে আমার আগেই সে সেই আগের মতো সুড়ুত করে যেন চোরের মতো ভেতরে ঢুকে পড়ল।

"দরজাটা বন্ধ করে তার দিকে চেয়ে এবার একটু কড়া গলাতেই বললাম, 'এ-হোটেলটা 'পশ' যাকে বলে সেইরকম খানদানি মোটেই নয়। তবে অনেক কালের চেনা, আর এদের আদর-যত্নের ব্যবস্থা খারাপ নয় বলে, এখানেই আমি সাধারণত উঠি। এ-হোটেলের ওপর আমার যেমন একটু টান আছে, এখানকার মালিক ম্যানেজারও তেমনি আমায় একটু খাতির করে। তাদের কিছু না-জানিয়ে বেআইনিভাবে সম্পূর্ণ অচেনা একজন লোককে আমার কামরায় থাকতে দেওয়ার মতো বেয়াড়া কাজের কথা যদি তারা জানতে পারে তাহলে আমার অবস্থাটা কী হবে? আমার এ কামরায় হোটেলের বয়-বেয়ারারা নানা ফরমাশ তামিল করতে আসে। হোটেলের ডাইনিং রুমে নয়, আমি এখানেই নিজের কামরায় ডিনার খাই। সে-ডিনার দিতে, প্লেট-টেট নিয়ে যেতে, আর আরও নানা কাজে বয়-বেয়ারারা যখন আসা-যাওয়া করবে, তখন আপনি তাদের চোখে পড়বেন না বলতে চান? কোথায় আপনি তখন লুকোবেন? বাথরুমে?'

" 'হ্যাঁ।' বলেই থতমত খেয়ে থেমে গিয়ে লোকটি শুকনো মুখে

কয়েক সেকেণ্ড পরে বললে, 'তাহলে ? তাহলে আমি চলেই যাই।'

"সে অসহায়ভাবে বাইরের দরজার দিকে পা বাড়াতে তাকে হাতের ইঙ্গিতে বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনার বিপদ খুব বেশি তা বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি তা থেকে বাঁচবার জন্যে আমার শরণ কেন নিলেন বলুন তো ?'

" 'আমি···আমি···কিছু না ভেবেচিন্তে প্রথম আপনাকে ট্যাক্সি করে যেতে দেখে আপনার গাড়িতে উঠে পড়েছি।'

"লোকটি আরও কী বলতে যাচ্ছিল। তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনি যা করেছেন তা তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি। কিন্তু আপনার কাজটা কীরকম হয়েছে জানেন ?'

"একটু থেমে কামরার একটা দেয়ালের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, 'হোটেলটা খুব নতুন নয়, তা আপনাকে আগেই বলেছি। ওই দেখুন, দেয়ালে একটা শিকারী মাকড়শা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ছোট্ট মাকড়শাগুলো জাল পাতে না। একা-একা শিকার করে বেড়ায়। পোকা বা মাছি দেখলে ওত পেতে থেকে জো বুঝে ঝাঁপ দিয়ে ধরে।'

"লোকটি এবার কেমন একটু সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে চাইছে। আমি ঠিক প্রকৃতিস্থ কি না এই বোধহয় সন্দেহ।

"তার সন্দেহটা একটু গভীর হতে দিয়েই বললাম, 'বাগে পেলে এ মাকড়শা মাছি-টাছি শিকার করে, কিন্তু ধরুন, কোনো মাছি যদি নিজে থেকে যেচে এসে ওর খপ্পরে পড়ে, তখন মাকড়শাটার কীরকম ভাব হতে পারে বুঝতে পারেন ?"

"লোকটা কোনো উত্তর না দিয়ে বেশ হতভম্ব আর একটু ভয়-ভয় মুখ নিয়ে আমার দিকে এবার চেয়ে রইল।

" 'বুঝতে ঠিক পারছেন না, না ?' আমিই আবার একটু হেসে

বললাম 'আচ্ছা অন্য একটা কথা বলি। আমি কে, তা তো আপনি জানেন না। আমি ট্যাক্সি করে চলে যাচ্ছি দেখে পালাবার জন্যে কিছু না ভেবেচিন্তে আমার গাড়িতে এসে উঠেছেন। এখন আমার পরিচয় একটু শুনুন। আমি এই হংকং শহরে কেন এসে আজ সাতদিন ধরে সমস্ত শহর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি? বেড়াচ্ছি শুধু একটি মানুষকে খোঁজবার জন্যে। তার নাম হ্যু'ব্যারী। রোগা পাতলা প্রায় হাঘরে চেহারা পোশাকের একটা নেহাত সাধারণ মানুষ। নাম যশ অর্থ প্রতিপত্তি, কিছুই তার নেই। তবু পৃথিবীর কারুর-কারুর কাছে তার দাম তার ওজনের হিরে-মানিকের চেয়ে বেশি। তেমনি একটি পার্টি হ্যু'ব্যারীকে খুঁজে বার করবার জন্যে যা চাই তা-ই খরচা আর ইনাম কবুল করে আমায় লাগিয়েছে। হ্যু'ব্যারীকে আমি এই হংকং শহরে খুঁজেও পেয়েছি। শুধু খুঁজেই পাইনি, সে নিজে থেকে…'

"এরপর আর কিছু আমার বলা হল না। হ্যু'ব্যারী নামটা করার পর থেকেই একেবারে ভয়ে সিঁটিয়ে, ফ্যাকাশে হয়ে লোকটা একটা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে যেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার কথার মাঝখানে শুকনো কাঁপা গলায় বললে, 'আপনি…আপনি আমাকে নিয়ে কী করবেন এখন?'

" 'আপনাকে নিয়ে!' এক মুহূর্তের জন্যে একটু মিথ্যে বিস্ময়ের ভান করতে গিয়ে খুব খারাপ লাগল বলে সোজাসুজিই এবার বললাম, 'আপনি তাহলে স্বীকার করছেন যে, হ্যু'ব্যারী আপনার নাম। কিন্তু কারা আপনাকে যেমন করে হোক, যেখানে হোক ধরবার জন্যে সমস্ত দুনিয়া খুঁজে বেড়াচ্ছে তা জানেন কি?'

" 'না।' শুকনো কাতর গলায় হ্যু'ব্যারী বলল, 'সত্যিই ঠিক করে জানি না। তবে তাদের যে অনেক ক্ষমতা, অনেক টাকা, পৃথিবীর

সমস্ত দেশেই যে তাদের লোকজন চর-টর আছে, এটুকু ভাল করেই বুঝতে পেরেছি।'

"হেসে বললাম, 'তাহলে অনেকটাই বুঝেছেন। কিন্তু কেন তারা আপনাকে ধরতে চায় তা কিছু জানেন কি?'

" 'জানি' একটু ইতস্তত করে বললে হ্যু'বারী 'তারা···তারা আমার সমস্ত কাজ নষ্ট করে দিতে চায়, আমায় তারা ব্যর্থ করতে চায়।'

" 'কিন্তু কেন তা চায়, কী আপনার কাজ, তা বলতে আপনার একটু দ্বিধা হচ্ছে কেমন?' এবার গম্ভীর হয়ে বললাম, 'এমনি বেকায়দায় পড়েও আপনার সব রহস্য আমার মতো অচেনা এক-জনের কাছে ফাঁস করতে চান না। তাহলে কী আপনার কাজের রহস্য, আর কেন কারা আপনাকে নিজেদের খপ্পরে পুরে সেকাজ নষ্ট করে দিতে চায় তা আমিই বলছি শুনুন।'

"হ্যু'ব্যারীর করুণ অসহায় চেহারা দেখলে তখন মায়া হয়। দেয়ালের ধার থেকে তাকে একটা সোফায় বসিয়ে তার পাশের আরেকটা আসনে বসে বলতে শুরু করলাম, 'উনিশশো তিয়াত্তরে আরব দেশগুলো তাদের অঢেল তেলের পুঁজির জোরেই গোদা-গোদা সব রাজাগজার দেশের বড়মানুষী গরম ঠাণ্ডা করে দেবার পর পৃথিবীর সব জায়গায় নতুন করে হিসেবনিকেশ শুরু হয়। এ-সব বিষয়ে মাথা যাদের পাকা, তারা এইটে তখন বুঝে ফেলেছে যে, আরবরা হঠাৎ আবার দয়া করলে বা নতুন আরও কটা আরব দেশের মতো তেলের খনি বেরুলেও পৃথিবীর জ্বালানির সমস্যা চিরকালের মতো তাতে মিটবে না। এখন যত অঢেলই মনে হোক, মানুষের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে পৃথিবীর বুকের এ-সব তেলের পুঁজি ক্রমশই একেবারে ফুরিয়ে যাবে। তখন উপায়? উপায় অনেক রকমই আছে

মনে হয়। পারমাণবিক শক্তি থেকে শুরু করে সূর্যের তাপ পর্যন্ত অনেক কিছু ভবিষ্যতের ভরসা হতে পারে। কিন্তু তা, অপর্যাপ্ত শুধু নয়, শস্তা আর সহজে পাবার মত হওয়া চাই। পৃথিবীর পয়লা নম্বর মহাজনী কারবারিরা তার চেয়েও যা বেশি চায়, তা হল যাকে বলে মৌরসি পাট্টা। দুনিয়ার জ্বালানির সমস্যা যা মেটাবে তা যেন গোনাগুনতি ক'জনের মাত্র দখলে থাকে। নগদ লাভ ওরা বোঝে, কিন্তু শুধু সেই দিকে নজর দিয়েই কাজ করে না। ওরা অনেক দূর-ভবিষ্যতের ওপর চোখ রেখে ঘুঁটি সাজাতে জানে। ও-সব দেশে তাই এস-এস-পি-এস অর্থাৎ স্যাটেলাইট সোলার পাওয়ার স্টেশন নিয়ে এক বিরাট কারবার ফাঁদা হয়েছে। এ-কারবারে জোট বেঁধেছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আর ধুরন্ধর টাকার কুমিরেরা।

"সূর্যের তাপ পৃথিবীতে যা পাওয়া যায়, তার চেয়ে মহাশূন্যে শুধু অনেক বেশি নয় সারাক্ষণই পাওয়া যায়। মহাকাশে অসংখ্য সূর্যের তাপ ধরবার যন্ত্র-বসানো 'স্যাটেলাইট' ঘুরিয়ে, তারই উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বেতার অণু-তরঙ্গে পৃথিবীর কারবারিদের নিজস্ব সব অণু-তরঙ্গ-ধরা অ্যান্টেনাগ্রীডের ঘাঁটিতে পাঠিয়ে, তা থেকেই সর্বত্র নিজেদের লাইনে পাঠাবার মতো হাই-ভোল্টেজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে এই কারবারিরা ভবিষ্যতের দুনিয়াকে নিজেদের হাতের মুঠোয় রাখবার জন্যে এস-এস-পি-এস নিয়ে এক বিরাট কোম্পানি গড়ে তুলছে। দু চার বছর নয়, অমন বিশ পঞ্চাশ, এমন কী, একশো বছর এরা অপেক্ষা করতে প্রস্তুত। এরা জানে, একদিন এদের কাছে পৃথিবীর সবাইকে হাত পাততে হবে। তাদের শুধু সাবধান থাকতে হবে, যাতে তাদের এই ভাবী শক্তি-সাম্রাজ্যের একাধিপত্যে বাদ সাধবার মতো কোথাও কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী

না গোকুলে বাড়তে পারে।

"একটু থেমে তার দিকে নালিশের আঙুল তুলে বললাম, 'আপনি সেই প্রতিদ্বন্দ্বী। কী এক আজগুবি ফন্দি খাটিয়ে আপনি ওদের এই একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ধসিয়ে দিতে চান···আপনি···'

" 'না, না,' অস্থিরভাবে আমার কথায় বাধা দিয়ে বললে হ্যু'ব্যারী, 'আমি যা করতে চাইছি, তা সত্যিই আজগুবি কিছু নয়। আমি একা নয়, আমার সঙ্গে আমারই মতো আরও ক'জন এই কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছে। আমরা সাম্রাজ্য গড়তে চাই না। পৃথিবীর সকলের জন্যে নিতান্ত শস্তায় এমন অঢেল এনার্জির ব্যবস্থা করতে চাই, যা আকাশ-বাতাসকে কোথাও এতটুকু নোংরা করবে না। আমরা একাজে অনেক দূর এগিয়েছি, আর কিছুদিন নির্বিঘ্নে একটু নিরিবিলিতে যদি কাজ করতে পারি, তাহলে আমাদের আবিষ্কারে আর উদ্ভাবনে পৃথিবী স্বর্গ হয়ে উঠবে। আমাদের আসল কাজটা যা নিয়ে তা এখনও কাউকে বলার উপায় নেই, তাই···'

" 'বলার দরকার নেই,' হ্যু'ব্যারীকে থামিয়ে বললাম, 'কী আপনাদের কাজ, তা আমি জানি।'

" 'জানেন?' অবাক আর সেই সঙ্গে একটু হতভম্ব গলায় বললে হ্যু'ব্যারী, 'কিন্তু আমরা তো···'

" 'আপনাদের আসল কাজ আর উদ্দেশ্য ঘুণাক্ষরেও কোথাও প্রকাশ করেননি, এই তো?' হ্যু'ব্যারীর কথাটা তার হয়ে শেষ করে দিয়ে বললাম, 'তা না-করলেও আপনারা কোথাও কোন্ গোপনে একটা নতুন ধরনের রেডিও টেলিস্কোপ বসিয়েছেন, এই খবরটুকুই অল্প-বিস্তর এখানে-ওখানে ছড়িয়েছে। কেউ-কেউ তার ওপর শুধু আর-একটু অনুমান করেছে, যে, অমন গোপনে চুপিচুপি কোথাও নতুন

রেডিও টেলিস্কোপ বসানো নেহাত বাতুল খামখেয়াল নয়। আমি কিন্তু জানি যে, আপনাদের কাজকর্মগুলো খামখেয়াল না হলেও ছোট শিশুর চাঁদ ধরতে চাওয়ার চেয়ে কম আজগুবি বাতুলতা নয়।'

" 'আজগুবি বাতুলতা বলছেন আপনি?' দ্যু'ব্যারী রীতিমতো ক্ষুণ্ণ।

" 'তা ছাড়া কী বলব?' একটু হেসে বললাম, 'অবোধ শিশু আকাশের চাঁদ ধরতে চায়, আর আপনারা চাইছেন চাঁদ-সূর্য-তারা-টারা কিছু নয়, মহাশূন্যের একটা ছেঁদা, একটা কালো ফুটো। সেই ফুটো দিয়েই দুনিয়ার সব 'এনার্জি'র সমস্যা আপনারা মিটিয়ে দেবেন। কয়লা, পেট্রোল কি পরমাণু-শক্তির আর কোনো দরকারই থাকবে না, এই তো আপনারা বলতে চান?'

"খানিক যেন ভোম মেরে চুপ করে থাকবার পর দ্যু'ব্যারী ধীরে ধীরে বললে, 'কী করে আপনি এসব জেনেছেন জানি না, কিন্তু সত্যিই এই কাজেই আমরা লেগে আছি। আকাশের একটা কালো ফুটো, এর মানে যদি সবাই বুঝত!'

"তার মুখ থেকে কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে বললাম, 'বৈজ্ঞানিকেরা নিজেরাই এখনও ভাল করে বোঝে কি? উনিশ শো সত্তরে আফ্রিকার 'কিনিয়া' থেকে 'উহুরু' নামে উপগ্রহকে পৃথিবী প্রদক্ষিণে ছাড়ার তিন মাস বাদে, এক্স-রে'র উৎস ধরে সিগনাস তারামণ্ডলে পৃথিবী থেকে প্রায় আট হাজার আলোকবর্ষ দূরের আমাদের সূর্যের বিশগুণ বড় এক জ্বলন্ত তারার বেতালা অয়নেই তার বিরাট সঙ্গী হিসেবে মহাশূন্যের প্রথম যথার্থ এক কালো ফুটোর হদিশ মেলে। মহাশূন্যের সেই কালো ফুটো যে কী, তা এখনো প্রায় বেশির ভাগই অঙ্ক দিয়ে হাতড়ানো অনুমান আর কল্পনা। মাধ্যাকর্ষণ এমন এক শক্তি, যা

দূরত্বের বর্গ হিসেবে বাড়ে কমে। দূরত্ব দু গুণ বাড়লে মাধ্যাকর্ষণ চারগুণ কমে যায়, আবার দূরত্ব তিন ভাগ কমলে তা ন'গুণ যায় বেড়ে। বিশ্বের বিরাট বিরাট রাক্ষুসে সব তারার তো বটেই, সব জ্বলন্ত নক্ষত্রই শেষ পর্যন্ত নিজের মাধ্যাকর্ষণের টানে কুঁকড়ে ছোট হতে হতে নিজের মধ্যেই এমন নিশ্চিহ্ন হয়ে তলিয়ে যায় যে, একটা আলোর কিরণেরও ক্ষমতা থাকে না সেই চরম মাধ্যাকর্ষণের টান ছাড়িয়ে বার হতে। জ্বলন্ত নক্ষত্রের সেই শেষ কবর মহাশূন্যের একটা কালো রাক্ষুসে ফুটো হয়ে থেকে যা নাগালের মধ্যে পায় তা শুধু গিলেই খায়। সে শুধু খায়, ওগরায় না কিছু। তার নাগালের মধ্যে পড়লে কোনো কিছুর নিস্তার নেই। সব কিছু সে টেনে নেবেই ফুটোর মধ্যে।'

" 'হ্যাঁ, ওই টেনে নেওয়ার ওপরই আমাদের সব ফন্দি খাটানো।' দ্যু'ব্যারী যেন আমার কথার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে, 'মহাশূন্যের কালো ফুটো সম্পর্কে অন্য-কিছু সঠিক জানা থাক বা না থাক, তা যে নাগালের মধ্যে যা পায়, অবিরাম নিজের গহ্বর-কবরে তা টেনে নেয়, এ-বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। তা ছাড়া আর-একটা বিষয়ে বেশির ভাগ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরই ধারণা যে, সমস্ত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যেমন অসংখ্য ছায়াপথ নক্ষত্র আছে, তেমনি আছে অগুনতি কালো ফুটো। আমাদের নিজেদের এই ছায়াপথেই এমন অন্তত এক কোটি কালো ফুটো থাকা অসম্ভব নয়। সে-সব ফুটো আবার বিরাট না-হয়ে নেহাত ছোটও হতে পারে।'

" একটু থেমে দম নিয়ে দ্যু'ব্যারী গর্বভরে বললে, 'তেমনি একটি কালো ফুটো আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি আমার রেডিও টেলিস্কোপে। সেটা সিগনাস এক্স-ওয়ান-এর মতো দূরও নয়, মাত্র দুই

আড়াই আলোকবর্ষ দূরে। আর কিছুদিন নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারলে তার অবস্থাটা আমি একেবারে নির্ভুলভাবে ছকে ফেলতে পারব। তাহলেই কাম ফতে। ওই খুদে কালো ফুটোর চারধারে কুয়ো বাঁধিয়ে দেবার মতো একটা উপগ্রহের কায়েমি চাকতি হিসেব করে মাপাজোখা দূরত্বে লাগিয়ে দিলেই, পাহাড়ী প্রপাতের জল পড়বার বেগ থেকে যেমন, কালো ফুটোর সর্বনাশা টান থেকে তার গলার চাকতিতে বসানো যন্ত্র দিয়ে তেমনি অফুরন্ত অগাধ এনার্জি পৃথিবীতে চিরকাল ধরে যোগান দেওয়া যাবে। আর কিছুদিন মাত্র বিনা উপদ্রবে নিরিবিলিতে কাজ করবার অবসরটুকু আমার দরকার। আমার রেডিও টেলিস্কোপ যে কোথায় কোন্ অজানা জায়গায় লুকনো, তা এরা জানে না। আমায় শুধু মাঝে মাঝে কিছু দরকারি সাজসরঞ্জাম আর রসদের জন্যে কোনো-না-কোনো বড় দেশের আধুনিক শহরে আসতে হয় বলে এবারে এদের নজরে আমি পড়ে গেছি। আমার কাজ শেষ করবার জন্যে যেমন করে হোক এদের কাছ থেকে লুকিয়ে নিজের ঘাঁটিতে আমায় পালাতে হবে। সেই সুযোগটুকু শুধু আমি চাই।'

"দ্যু'ব্যারী আমাকেই যেন দেবতা বানিয়ে তার প্রার্থনা জানালে!

"অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাই বলতে হল, 'সে সুযোগ তো আপনি পাবেন না মঁসিয়ে দ্যু'ব্যারী। যারা আপনার পেছনে লেগে আছে, তারা আপনার ওই কালো ফুটো কবজা করবার ফন্দি নেহাত আজগুবি ঘোড়ার ডিম মনে করলেও সাবধানের মার নেই হিসেবে আপনাকে নিজের খুশিমতো পাগলামি করবার জন্যেও ছেড়ে দেবে না। তাদের একজন হিসেবে আমি আপনার সামনেই আছি। তা ছাড়া এই হোটেলে আর তার বাইরে কতজন যে এই শহরে আপনার ওপর নজর রাখবার জন্যে আছে, তা আমিও জানি না। এদের হাত

ছাড়িয়ে, এখন আর আপনি পালাতে পারবেন না।'

"এতক্ষণে হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়ে দ্যু'ব্যারী বললে, 'তাহলে কী করতে চান এখন আমাকে নিয়ে ?'

" 'আপনাকে আমি ধরিয়ে দেব।' শক্ত হয়েই বললাম, 'তবে আপনার নিজের সম্মানের খাতিরে আর হোটেলের সুনামের জন্যে সামনের কোনো লিফটে হোটেলের লবি দিয়ে আপনাকে নিয়ে যেতে চাই না। হোটেলের পেছনের দিকে দরকারমতো হোটেলের মালমাত্র তোলা আর নামানোর জন্যে যে সার্ভিস লিফট আছে, তাই দিয়েই আপনাকে নিয়ে যাব। যাবার আগে শুধু দু-একটা কাজ সারবার আছে।'

"সে-সব কাজ সেরে যখন দ্যু'ব্যারীকে নিয়ে যাবার জন্যে ডাকলাম, তখন সে যেভাবে বিনা প্রতিবাদে সোফা থেকে উঠে এল, তাতে মনে হল, সব আশা-ভরসা হারিয়ে সে একটা নিষ্প্রাণ পুতুল হয়ে গেছে। সোফায় এলিয়ে পড়ে থেকে আমি যে এতক্ষণ কী করেছি, তাও সে লক্ষ করেনি।

"দ্যু'ব্যারীকে যা বলেছিলাম, সেইমতো পুলিস-ঘাঁটিতে রেখে আসবার পর সামনের গেট দিয়েই হোটেলে ঢোকবার সময় বোরোত্রাকে প্রথম দেখলাম। তার নিজের চেহারা এমন যে, সামনে কোথাও পড়লে পাঁচশো জনের মধ্যেও লক্ষ না করে উপায় নেই, বিরাট বপু আর তার সেই জালার মতো বিশাল ভুঁড়িটির জন্যে মানুষের চেয়ে তাকে হিপোপটেমাসেরই স্বজাতি বলে মনে হয়। এর ওপর আর-একটি কারণে তাকে সব সময়ে আলাদা করে চেনা যাবে। তাকে কোথাও কখনো একলা দেখা যায় না। একটি নিত্যসঙ্গী তার সঙ্গে সব সময় থাকে।

"সেদিনও সেই সঙ্গীটিকে কাছে নিয়েই সে বসেছে। জালার মতো ভুঁড়ি নিয়ে দৈত্যের মতো চেহারায় নিজে যে চেয়ারটাতে বসেছে, তার পাশের চেয়ারটিতেই রেখেছে তাঁর পুঁচকে সেই নিত্যসঙ্গীটিকে।

"লবি দিয়ে লিফটের দিকে যাবার পথে এরকম মানুষটাকে দেখে দু সেকেণ্ডের বেশি মনোযোগ হয়ত দিতাম না। কিন্তু হঠাৎ ক'টা কথা কানে গিয়ে ছুঁচের মতো বেঁধায় লিফটের খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েও ওপরে এখনই যাব কিনা ভাবতে হল।

"তখনও অবশ্য লোকটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে পুঁচকে সঙ্গীর সঙ্গে তার কথাগুলো যে শুনেছি, তা আমি বুঝতে দিইনি। লিফটটা তখনও ভাগ্যক্রমে নামেনি। সেটার জন্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার মধ্যে আরও কটা কথা শুনে কান ঝাঁঝাঁ করার বদলে মজাই পেলাম।

"জ্বলে ওঠার বদলে মজা পাওয়াটাই অবশ্য গোড়া থেকে উচিত ছিল। তবে তখন আচমকা ওই ধরনের কথাগুলো ওইভাবে আর ওই ভাষায় শুনে মেজাজটা একটু টালমাটাল হয়ে গিয়েছিল ঠিকই।

"লোকটার আর তার সঙ্গীর দিকে একবার নজর দিয়েই লিফটের দিকে যেতে-যেতে একটা সরু পিনপিনে গলায় শুনেছিলাম 'ওই শুঁটকো চামচিকেটাকেই খুঁজছিলি না?' তার উত্তরে ভারী গলার কথা শোনা গেছল, 'হুঁ।' 'তাহলে চুপ করে বসে আছিস কেন?' আবার সেই পিনপিনে ছুঁচলো গলায় শোনা গেল, 'ডাক না ছুঁচোটাকে! আর না যদি আসে, তবে দে মুর্গির গলাটা মুচড়ে ছিঁড়ে।' কথাগুলোর পরেই সেই পিনপিনে ছুঁচলো গলার হিহি করে বিদঘুটে হাসি। আর সেই ভারী গলায় আদরের ধমক, 'আরে চুপ চুপ, লোকে বুঝতে পারবে।'

"লবিতে ওদের কাছাকাছি যারা ছিল, তাদের অনেকেই তখন

এই বাক্যালাপে হাসছে। তবে তার মানে বুঝে নয়। কারণ সেমানে বোঝা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় এই জন্যে যে, বাক্যালাপের ভাষাটা হল 'বাস্‌ক্‌', পৃথিবীর মধ্যে যা বিরলতম ভাষার একটি। লোকগুলো হাসছিল মিহি আর মোটা গলা দুটোর কথাবলাবলির ধরনে।

"লিফটটা এতক্ষণে ওপর থেকে নামতে শুরু করেছে। কিন্তু আমাকে আর তাতে উঠব কি উঠব না তা ঠিক করবার দ্বিধায় থাকতে হল না। লিফটের কাছে তখন আমিই একা দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ পেছন থেকে ভারী গলায় ফরাসিতে অত্যন্ত ভদ্র বিনীত অনুরোধ শুনলাম 'ও মশাই, লিফটের কাছে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে বলছি। দয়া করে আমাদের এ টেবিলে একটু এসে আমাদের বাধিত করবেন? আমার শরীরটা বড় বেসামাল, নইলে আমিই এখনি উঠে যেতাম। কিছু মনে করবেন না।'

"কথাগুলো যতক্ষণ বলা হচ্ছে, তার মধ্যে লিফটের দরজার কাছ থেকে প্রথম যেন অবাক হয়ে, ঘাড় ফিরিয়ে কে আমায় ডাকছে দেখে আমি একটু যেন অবাক হয়ে ওই দুই মূর্তির টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

"দৈত্যাকার মানুষটা তখন তার সঙ্গীটিকে বাঁ হাতের মুঠোয় তার চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে ডান হাত বাড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করে বলছে, 'আমায় মাপ করবেন। একটু বিশেষ কারণে আপনাকে এমন করে বিরক্ত করলাম। আমার নাম বোরোত্রা, হ্যাঁ বোরোত্রা, আর এর নাম হল...'

" 'আমার নাম পিঁপিঁ। পিঁপিঁ।' বোরোত্রার আগেই তার বাঁ হাতের মুঠোর পুঁচকে সঙ্গী যেন ছটফটিয়ে উঠে সরু খ্যানখেনে গলায়

ব'লে উঠল, তারপর দাঁতে-দাঁত-চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে সেই বাস্‌ক্‌ ভাষাতে বললে, 'ছুঁচোটা যেন আমায় না ছোঁয়।'

"যেন কিছুই বুঝতে পারিনি, এমনি মজা-পাওয়া মুখ করে আমি পিঁপিঁর একটা খুদে নরম হাত ধরে নাড়া দিয়ে বললাম, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম সেনর পিঁপিঁ। আমার নাম হল দাস। শুধু দাস।'

"পিঁপিঁ তখন কাছাকাছি সকলের হাসির মধ্যেই কঁকিয়ে উঠে, চিৎকার করে আমায় গাল পাড়ছে ফরাসি ভাষাতেই। 'ছিঁড়ে গেছে নড়াটা আমার, ছিঁড়ে গেছে একেবারে! ওরে বাবা রে! মরে গেছি রে!'

"সেই সঙ্গে বাস্‌ক্‌ ভাষায় ফোড়নও চালাচ্ছে মাঝে-মাঝে। যেমন, 'চিমসেটাকে দে না নিংড়ে শেষ করে, কিংবা 'ছারপোকাটা টিপে মার।'

"বাস্‌ক্‌ তো নয়ই, ফরাসিও কেউ বুঝুক বা না-বুঝুক কাছাকাছি যারা ছিল, তারা পিঁপিঁর সেই সরু খ্যানখেনে গলার কাতরানি আর সেই সঙ্গে 'চুপ! চুপ!' বলে বোরোত্রার ভারী গলার ধমকে দারুণ মজা পেয়ে হাসি আর থামাতে পারেনি।

"তাদের হাসির কারণ হ'ল পিঁপিঁ। পিঁপিঁ একটা তুলো-ভরে-সেলাই-করা পুঁচকে পুতুল। 'ভেন্ট্রিলোকুইস্ট'রা মুখ না নেড়ে তাদের ছদ্ম-গলার কথা যেন অন্য জায়গা থেকে বার করবার জন্যে এই পুতুল ব্যবহার করে। এ-পুতুলকে দিয়ে মজা করে অনেক উল্টো-পাল্টা খোঁচানো কথা বলানোও যায়।

"বোরোত্রা সব সময়ে এই পুতুল তার সঙ্গে রাখে। এ-পুতুলকে দিয়ে যখন-তখন যেখানে-সেখানে বেয়াড়া কথা বলানো তার শুধু

একটা মজার খেলা নয়, এটা তার একটা রোগও। নিজের মনের কথাগুলো এইভাবে সে পেট থেকে বার না-করে দিয়ে পারে না। কেউ যাতে কিছু বুঝতে না পারে সেই জন্যেই সে অবশ্য বাস্‌ক্‌-এর মতো এমন একটা ভাষা ব্যবহার করে, যা দুনিয়ার কেউ জানে না বললেই হয়।"

ঘনাদা থামলেন। তাঁর একটানা কাহিনী শোনার মধ্যে অবাক হয়ে আর একটা ব্যাপারও আমরা লক্ষ করেছি। এতক্ষণের মধ্যে ঘনাদা একবার একটা সিগারেটও খাননি। শিশির অবশ্য মেজাজ খারাপ থাকার দরুন ইচ্ছে করেই নিজে থেকে তাঁকে সিগারেট এগিয়ে দেবার চেষ্টা করেনি। কিন্তু ঘনাদার তো ভালমানুষের মতো তা মেনে নিয়ে চুপ করে থাকার কথা নয়।

এখন এতক্ষণের অন্যায়টা শোধরাবার জন্যে শিশির যখন পকেটে হাত দিতে যাচ্ছে, ঘনাদা তখন নিজের পকেট থেকেই সিগারেটের একটা প্যাকেট বার করে আমাদের চমকে দিলেন।

সে আবার যেমন-তেমন সিগারেট নয়। প্যাকেটের এক কোণ ছিঁড়ে তা থেকে একটা সিগারেট অবহেলাভরে বার করার সময় খানদানি গন্ধটাই শুধু নাকে গেল না, প্যাকেটের ওপর ছাপা ব্রাণ্ডের নামটা পড়েও চোখ কপালে ওঠবার যোগাড়।

বিদেশী একেবারে পয়লা নম্বরের একটা সিগারেট। ঘনাদা এয়ারপোর্ট হোটেলেই কিনেছেন নিশ্চয়।

এখন সেটা ধরাবার জন্যে শিশিরের দেশলাইকাঠি জ্বালবারও অপেক্ষা করলেন না। নিজেই আর এক পকেট থেকে এক বিদেশী দেশলাইয়ের খাপ বার করে তার কাঠি খুলে জ্বেলে সিগারেট ধরালেন।
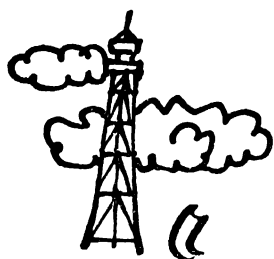
ঘনাদার মৌজ করে সেই সিগারেট খাওয়ার মধ্যেই গৌর তার হাতঘড়িটা আমাদের দেখাতে বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে আমরা পরস্পরের সঙ্গে চোখাচোখি করলাম। বেলা তো প্রায় দেড়টা হয়ে গেছে। আমাদের তো বটেই, ঘনাদা নিজেরও নাওয়া-খাওয়ার কথা ভুলে গেছেন নাকি? গল্প যা ফেঁদেছেন, তা এত বেশি সবিস্তারে বলার মধ্যে অতিমাত্রায় বেলা বাড়িয়ে দিয়ে আসল কথাটা গোলেমালে হারিয়ে ফেলে দেওয়ার মতলব নেই তো?

সিগারেটে ঘনাদার দু'-চারটে রামটানের পর তাই একটু কড়া গলাতেই বলতে হল, "এ সব বৃত্তান্ত তো অনেক শোনালেন! সারাদিন ধরে নাওয়া খাওয়া ভুলে এ-বৃত্তান্ত শুনলে আমাদের মোক্ষলাভ হবে, না পল্টুবাবুর গাড়ির আট-ন গ্যালন তেল ফুঁকে দিয়ে আসার ঠিকমত জবাবদিহি পাব?"

"কেন ? কেন ?" আমাদের সকলের চোখ কপালে তুলিয়ে পল্টুবাবুই ঘনাদার হয়ে জোরালো ওকালতি করলেন, "ওঁকে অমন যা-তা বলছ কেন ? উনি যা বলছেন, আমার আট-ন গ্যালন তেলটা তার চেয়ে দামি হল তোমাদের কাছে ? না, না, আপনি বলুন, বলে যান। একদিন অমন নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হলে যার নাড়ি ছেড়ে যায়, সে চলে গিয়ে খাওয়া-দাওয়াই করুক। বলে যান আপনি।"

হায় কপাল! যার জন্যে লড়তে নামি, সে-ই বন্দুকের নল দেয় ঘুরিয়ে!

আমাদের উড়ন্ত নিশান একেবারে ভিজে ন্যাকড়ার মতোই নেতিয়ে পড়ে। ঘনাদা তার ওপর কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে দিয়ে বললেন, "না, না, খিদে-তেষ্টার কথা মনে রাখতে হবে বই কী! সকলের সহ্যশক্তি তো আর সমান নয়। তাছাড়া বেলাও বড় কম হয়নি। তবে আমারও বলার খুব বেশি কিছু আর নেই।"

"বোরোত্রার নিজের সঙ্গে সারাক্ষণ পুতুলের ছল করে কথা বলবার ওই বদভ্যাসটা যে একটা রোগ, সেদিন হংকং-এর চীনা হোটেলের লবিতেই সেরকম একটা সন্দেহ হয়েছিল। আমার সন্দেহটা ঠিক না হলে তার সঙ্গে জীবনে দ্বিতীয়বার দেখা আর অবশ্য হত না। আর তা না হলে ই-ইউ-ডব্লিউ-সি নামটা দুনিয়া থেকে মুছে গিয়ে এস-এস-পি-এস-এর সাম্রাজ্যই নিশ্চয় সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করে নিত।

"সেদিন চীনা হোটেলের লবিতে পরিচয়-টরিচয় করার পর বোরোত্রা যেরকম খাতির করে আমায় তার সামনের চেয়ারে বসিয়েছিল, আর তার সঙ্গী পুচকে পিঁপিঁর বেয়াদবি মাপ করতে বলে যে-ভাবে একটা দুঃখের কাহিনী আমায় শুনিয়েছিল, তাতে

নেহাত বাস্‌ক্‌ ভাষাটা জানা না-থাকলে তার সম্বন্ধে একটু দ্বিধায় হয়ত আমি পড়তে পারতাম। পেটের দায়ে এস-এস-পি-এস-এর চর হলেও ভবঘুরে বাজিকর হিসেবে লোকটা খুব খারাপ নয়, এমন ধারণা আমার হতে পারত। আর দ্যু'ব্যারী সম্বন্ধে সে যা আমায় শুনিয়েছিল, তার কতকটা সত্য বলে বিশ্বাসও হয়ত আমার হত।

"দ্যু'ব্যারী সম্বন্ধে গল্পটা সে বেশ কায়দা করেই সাজিয়েছিল। নিজেকে ধোয়া তুলসীপাতার মতো সাধু বা দ্যু'ব্যারীকে মিটমিটে বিচ্ছু শয়তানগোছের কিছু হিসেবে সে মোটেই সাজায়নি।

"তার বদলে দ্যু'ব্যারী যে তার দেশেরই ছেলে আর ছেলে-বেলার বন্ধু এ-কথা জানিয়ে, আজ নিয়তির ঘুঁটি নাড়ায় দুজনে সম্পূর্ণ বিপরীত দলে ভিড়লেও কেন সে পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে দ্যু'ব্যারীর একটা চরম উপকার করতে চাইছে, সে-কথা আমায় বলেছে। যা বলেছে, তা খুব অবিশ্বাস্য ব্যাপারও নয়। দ্যু'ব্যারী যখন জীবন-মরণ তুচ্ছ করে কোনো এক অজানা আস্তানায় তার কী আশ্চর্য সাধনা চালিয়ে যাচ্ছে, তখন যে-কয়জনের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের উপর বিশ্বাস রেখে সে তার দল গড়ে তুলছে, তাদের কেউ কেউ নাকি শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবার ফন্দি এঁটেছে। আগেকার দিন আর বন্ধুত্বের খাতিরে সময় থাকতে সাবধান হবার জন্যে দ্যু'ব্যারীকে এই খবরটা শুধু বোরোত্রা দিতে চায়। দ্যু'ব্যারীর পেছনে তাই সে এমন করে ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দ্যু'ব্যারী তাকে এখন এত অবিশ্বাস করে যে, তাকে ক'মিনিটের জন্যে কাছে আসবার সেই সুযোগটুকুও দিচ্ছে না। এ পর্যন্ত বারবার একেবারে মুখোমুখি হওয়ার অবস্থায় যেমন করে হোক এড়িয়ে

পালিয়েছে।

"বোরোত্রার এ-গল্প বেশ যেন মন দিয়ে শুনেছিলাম। তবে এ-গল্প বলার মধ্যে পিঁপিঁ একবারও বাধা দেয়নি, এটাও লক্ষ করেছি। গল্প শেষ হলে একটু যেন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, 'কিন্তু এসব কথা আমায় শোনাচ্ছেন কেন?'

"পিঁপিঁ কী যেন একটা বলতে মিহি সুর তুলতে যাচ্ছিল। ক্যাঁক করে তার গলা টিপে ধরে বোরোত্রা সবিনয়ে বলেছে, মাপ করবেন সেনর দাস। আপনার চেহারাটা যে-কোনো জায়গায়, বিশেষ করে এখানকার মানুষজনের মধ্যে, একটু চোখে পড়বার মত তো। তাই আমাদের জানাশোনাদের কেউ-কেউ আপনাকে লক্ষ করার সময়ে হ্যু'ব্যারীর মতো কাউকে যেন আপনার ট্যাক্সিতে লুকিয়ে উঠতে দেখেছে। এই খবরটা তাদের কারুর-কারুর কাছে পাবার পরই যাচাই করতে আপনার এখানে এসেছি।'

"বেশ একটু কৃতার্থভাবে হেসে এবার বলেছি, 'এবার তাহলে আপনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতে পারেন।'

" 'ভাগ্যবান?' বোরোত্রা সত্যি সত্যিই কথাটার মানে বুঝতে না-পেরে সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে চেয়েছে।

" 'ভাগ্যবান মানে বুঝতে পারছেন না?' কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে লিফটটার দিকে আঙুল দেখিয়েছি। তারপর সেদিকে যেতে যেতে বলেছি, 'আপনার ছেলেবেলার বন্ধু হ্যু'ব্যারীর সঙ্গে এতদিন বাদে আজ আপনার দেখা এখুনি হবে বলে আপনাকে ভাগ্যবান বলছি।'

"লিফটটা ভাগ্যক্রমে নিজেই তখন খালি অবস্থায় নেমেছে।

বোরোত্রা আর তার পুচকে সঙ্গীকে নিয়ে সেই লিফটে ওপরে উঠতে-উঠতে আরও আশ্বাস দিয়ে বলেছি, 'আপনার বন্ধু হ্যু'ব্যারী সত্যিই আমার ট্যাক্সিতে এখানে এসে কাকুতি-মিনতি করে আমার কামরায় আশ্রয় চেয়েছে। আশ্রয় দিলেও তার ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে মনে হওয়ায় 'এই আসছি' বলে কামরার দরজায় তালা দিয়ে তাকে আটকে রেখে এসেছি।'

"আমার কামরার সামনে দাঁড়িয়ে নিজস্ব চাবি লাগিয়ে দরজাটা খোলার সময় বোরোত্রার চেহারাটা ফোটো তুলে রাখবার মতো। উত্তেজনায় সে যেন তখন ফেটে পড়ছে। তার বাঁ বগলে রাখা পিঁপিঁ তো কান-ফুটো-করা হুইস্‌লের স্বরে চেঁচিয়েছে, 'খোল শিগগির, খোল।'

"দরজা খুলতে-না-খুলতে হুড়মুড় করে ঢুকেছে বোরোত্রা। পিঁপিঁর জবানিতে আমার এতক্ষণের সব অপমানের শোধও তখন আমি নিতে পেরেছি।

"বোরোত্রা সমস্ত কামরাটা তো বটেই, বাথরুম এমন কী ওয়ারড্রোব পর্যন্ত খুলে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেশ গরম গলায় বলেছে, 'কই গেল কোথায় হ্যু'ব্যারী?'

"আমিও একেবারে তাজ্জব বনে যাওয়ার ভান করে বলেছি, 'তাই তো! এই বন্ধ কামরা থেকে সে যাবে কোথায়?'

"তারপরই যেন হঠাৎ কী মনে হওয়ায় পেছনের একটা জানলার দিকে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে উঠেছি, 'এই তো, এই তো হ্যু'ব্যারীর পালাবার প্যাঁচ!'

"বোরোত্রাও তখন হাঁফাতে হাঁফাতে এসে দাঁড়িয়েছে।

"প্যাঁচটা দেখে তার মুখ আরও থমথমে হয়ে উঠেছে। হবারই

কথা। কারণ সেখানে একটা খড়খড়িতে বেঁধে দুটো পাকানো চাদর পরপর গিঁট দিয়ে যেভাবে ঝোলানো, তাতে তা বেয়ে নামবার চেষ্টা করলে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু করা যায় না। পাঁচতলা থেকে দুটো চাদর চারতলা ছাড়িয়ে সামান্য একটু পৌঁছেছে মাত্র। সেখানে ওদিকের খাড়া দেওয়ালে একটা জানলার কার্নিশও নেই একটু পায়ের ভর দেওয়ার। একমাত্র গতি সুতরাং সেখান থেকে হাত পা ছেড়ে নীচে লাফ। প্রমাণ-প্রায় চারতলা সমান উঁচু থেকে সে-লাফ কেউ দিলে তার হাড়গোড়ের টুকরোগুলোও সব খুঁজে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

"জানলার খড়খড়িতে বাঁধা চাদর দুটো যে নেহাত ছেলেভুলোনো মিথ্যে চালাকি, তা একবার নজর দিলেই বোঝা যায়।

"বোরোত্রার মুখ যত থমথমে হয়ে উঠেছে, পিঁপিঁর গলা তত হয়েছে কান-ফুটো-করা। অসহ্য ছুঁচলো গলায় বাস্ক্-এ সে চেঁচিয়েছে, 'সব মিথ্যে কথা! তোর সঙ্গে মস্করা করছে কালা নেংটিটা। জিভটা ওর টেনে ছিঁড়ে ফেল্! নাহয় চটকে দলা পাকিয়ে ফেলে দে এই পাঁচতলা থেকে। দে, ফেলে দে! দেখছিস কী?'

"বোরোত্রা গম্ভীর মুখে যেন মেঘলা আকাশের গায়ে বাজ-গড়ানো আওয়াজে বলেছে, 'সবুর, সবুর। দু'দিন ওর দৌড়টা একটু দেখেই টুঁটি চেপে ধরব।'

"কিছুই যেন না-বুঝে বোকা-বোকা মুখে আমি বোরোত্রাকে সহানুভূতি জানিয়েছি, 'সত্যি এমন করে জ্বালাবে, ভাবতেও পারিনি।'

"পিঁপিঁ চিড়বিড়িয়ে উঠেছে, 'থোঁতা মুখটা ভোঁতা করে দে না।'

"বোরোত্রা যেন মেঘ-ডাকা আওয়াজে বলেছে, 'দেব, দেব। দুটো দিন শুধু নজরে রাখি।'

"নজরে রাখতে সে পারেনি। তার নিজের আর তার সঙ্গী চর-অনুচরদের চোখে ধুলো দিয়ে কখন যে আমি হংকং থেকে চীনেদের মাছধরা নৌকোয় সরে পড়েছি, জানতেও পারেনি তারা। জানবেই বা কী করে? তাদের পাহারায় গাফিলি কিছু ছিল না। কিন্তু সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার কোনো ট্রলারে মাছের জন্যে পাঠানো সব বরফের বাক্সের কোনোটায় যে মানুষ থাকতে পারে, তা তাদের মাথায় আসেনি।

"নিজে সরে পড়বার আগে এক বেলার জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা সেখানকার পুলিস-ফাঁড়িতে-জমা-করে-রাখা দ্যু'ব্যারীকেও সেখান থেকে ছাড়িয়ে ওই জেলে-নৌকোতেই পালাবার ব্যবস্থা করবার সময় তার সঙ্গে সব বোঝাপড়াও করে নিয়েছি। বোঝাপড়া শুধু এই যে, তখন থেকে আমিও তাদের ই-ইউ-ডব্লিউ-সি-র একজন অংশীদার হয়েছি। দ্যু'ব্যারী তার রেডিও টেলিস্কোপের গোপন ঘাঁটিতে নির্বিঘ্নে যাতে তার বাকি কাজটুকু সারতে পারে, বাইরের দুনিয়ায় তারই একজন প্রধান পাহারাদার হওয়া আমার কাজ। দ্যু'ব্যারীকে হংকং থেকে পাচার করবার সময় আর-একটা পরামর্শও তাকে দিয়েছি। ছোট-বড় দরকার-টরকার যা মাঝে-মাঝে হয়, তার জন্যে লণ্ডন নিউইয়র্ক প্যারিস তো নয়ই, হংকং-এর মতো দুনিয়াদারির শহরে সে যেন না আসে। আর কাজ শেষ হবার আগে আমার সঙ্গেও কোনো যোগাযোগের চেষ্টা যেন না করে।

"তা সে করেনি। কিন্তু আমার পরামর্শ-মতোই নিশ্চয় অন্য বড় শহর-টহরের বদলে কলকাতায় সওদা করতে এসেই প্রায়

সর্বনাশ বাধাতে বসেছিল।

"এস-এস-পি-এস তো কম পাত্তর নয়। তারাও চুপ করে বসে থাকেনি। ওত পেতে থেকে-থেকে ওদের ওই বোরোত্রা কেমন করে হ্যু'ব্যারীর কলকাতা আসার খবরটা ঠিক পেয়ে গেছে। হ্যু'ব্যারীর পেছনে ও যে কলকাতাতে এসেছে, তা আমি আর কেমন করে জানব।

"কিন্তু বোরোত্রার ওই ভেন্‌ট্রিলোকুইজমের কায়দায় নিজের সঙ্গে হরদম কথা বলার রোগই তাকে ধরিয়ে দিয়েছে। তার এ-রোগ না-থাকলে আর পল্টুবাবুর গাড়িটা ঠিক ওই সময়েই না পেলে, পৃথিবীর এনার্জির সমস্যা মিটতে কত যুগ লাগত কে জানে!"

৬

ঘনাদা একটু থামতেই পল্টুবাবু প্রথম গদগদ হলেন। "তাহলে ভাগ্যিস আমি গাড়িটা নিয়ে আজ অমন সময়ে এসে পড়েছিলাম!"

আমাদের ক'জনের গলায় খুকখুকে কাসিটা তখন প্রায় ছোঁয়াচে হয়ে উঠেছে। ঘনাদা সেটা অগ্রাহ্য করেই উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই। ওই গাড়িটা না থাকলে বোরোত্রার হদিশ কখনো পেতাম! রাসবিহারীর মোড়ে ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়েছি, বোরোত্রা তখন তার বন্ধ গাড়ির ভেতরে মনের সুখে পিঁপিঁর সঙ্গে বাস্‌ক্‌-এ আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। সেই আলাপ শোনবার পর আর তার পেছন ছাড়ি! তার দামি বিদেশী গাড়ির সঙ্গে লেগে থাকতে অবশ্য আমাদের জিভ বেরিয়ে গেছে।

"তবু শহর ছাড়িয়ে দমদমের রাস্তায় শেষ পর্যন্ত তার গাড়িটাকে এয়ারপোর্ট হোটেলের দিকে যেতে দেখেই তার পিছু ছেড়ে সোজা

এয়ারপোর্টে গিয়ে, ইস্টার্ন ফ্লাইটস্-এর ওয়েটিং হল-এ গিয়ে হাজির হয়েছি। অনুমানে আমার ভুল হয়নি, ভাগ্যটাও ভাল, হ্যু'ব্যারী তার সেই মার্কামারা আখ্‌খুটে হাঘরে চেহারা পোশাকে একটু আগে-আগেই এসে তার মাল ওজন করাতে দাঁড়িয়েছে।

"আমাকে দেখে সে তো যেমন অবাক, তেমনি আহ্লাদে আটখানা। গলগল করে কী যে জিজ্ঞাসা করবে, আর কোন্ কথা যে আগে বলবে, তাই ঠিক করতে পারছে না।

"গম্ভীর মুখে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছি, 'ওজন করাতে হবে না, মাল নিয়ে শিগ্‌গির ওদিকে চলো।'

"এ-কথায় একেবারে হতভম্ব হলেও হ্যু'ব্যারী প্রতিবাদ কিছু করেনি। তাকে নিয়ে তারপর একদিকের নির্জন একটা কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছি, 'এ-ফ্লাইটে যাওয়া তোমার হবে না। তোমায় অন্য প্লেনে অন্য কোথাও যেতে হবে।'

" 'কোথায়?' হ্যু'ব্যারী এই প্রশ্নটুকু শুধু করে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছে।

" 'কোথায়, তা জানি না।' তাকে আরও বিমূঢ় করে বলেছি, 'এখন অন্য যে-কোনো ফ্লাইটে একটা-না-একটা সীট খালি পাওয়া যাবে, তাতেই।'

"আর-কোনো প্রতিবাদ বা প্রশ্ন না-করে হ্যু'বারী এবার বলেছে, 'এখনো সময় আছে, আমার যাওয়াটা তাহলে বাতিল করিয়ে আসি।'

" 'বাতিল করিয়ে আসবে!' একটু থেমে ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, 'সঙ্গে তোমার পুঁজির অবস্থা কী রকম? এ টিকিট ক্যানসেল

না করলেও প্রথমে কাছাকাছি কোথাও আর তারপর সেখান থেকে আবার ফিরে তোমার নিজের জায়গায় যাবার নতুন টিকিট করার মতো খরচে কুলোবে ?'

"একটু ভেবে নিয়ে ত্যু'ব্যারী বলেছে, 'ক'টা জিনিস এখানে কিনতে পারিনি। তাই সঙ্গে যা আছে তাতে একরকম কুলিয়ে যাবে।'

" 'তাহলে টিকিট ক্যানসেল করতে হবে না।' তাকে বুঝিয়ে বলেছি, 'তুমি যেন এই ফ্লাইটেই যাচ্ছ, এইটেই সবাই জানুক। না-এসে-পৌঁছনো প্যাসেঞ্জার হিসেবে তোমার নাম শেষ পর্যন্ত মাইকে ডেকে যাবে। তাই যাক। শেষ মুহূর্তেও তুমি এসে পড়তে পারো, এইরকম একটা ধারণা ভাঙবার কোনো কারণ যেন না থাকে।'

"ত্যু'ব্যারীর মালপত্র নিয়ে তাকে ঘরোয়া বিমান-যাত্রীদের ঘাঁটিতে রওনা করিয়ে দেবার সময়ে সে হঠাৎ আমার হাতটা ধরে ফেলে বললে, 'তুমি যা করছ তা অনেক ভেবেচিন্তে বুঝেসুঝেই করছ, এ-বিশ্বাস আছে বলে কোনো প্রশ্ন তোমাকে করব না। একটা কথা শুধু তোমায় বলে যাই, দাস। তোমার সঙ্গে দেখা আমার শিগগিরই আবার হবে। আর তা লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়, ত্বনিয়ার সকলকে সগৌরবে জানিয়ে। কারণ আমার সাধনা আমি প্রায় ষোল-আনাই সফল করে এনেছি।'

"এরপর পকেট থেকে একটা নোটবইয়ের মতো খাতা বার করে আমার হাতে দিয়ে আবার বললে, 'এই খাতাটা সেইজন্যেই তোমায় দিয়ে যাচ্ছি। এতে সব পাতায় আমার সই আছে। তা থাক বা না থাক, শুধু তোমার সই থাকলেই এ খাতার পাতা কিংবা যে-কোনো সাদা কাগজ এখন থেকে লক্ষ টাকার চেয়েও দামি। কারণ সবচেয়ে যা ত্বষ্প্রাপ্য আর মূল্যবান, সেই এনার্জি তুমি যাকে

যত খুশি দেবার হ্যাণ্ডনোট লিখে দিতে পারো। পৃথিবীর সব এনার্জির চাহিদা চিরকালের মতো মেটাবার মতো মহাশূন্যের কালো ফুটো আমি পেয়েছি।'

"কথাগুলো বলে নিজের আবেগেই হ্যু'ব্যারী আর আমার দিকে না-ফিরে হন হন করে তার মালের ঠেলার সঙ্গে এগিয়ে চলে গেল।

"একটু দাঁড়িয়ে আমি আবার আগের ওয়েটিং হলেই ফিরে এলাম। আমার একটু দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি। বোরোত্রাও এয়ারপোর্ট হোটেলে বেশ ভালরকম সেঁটেই নিশ্চয় সবে তখন তার মালপত্র ওজন করাচ্ছে।

"সঙ্গে তার পিঁপিঁ আছে ঠিকই। ওজন করাতে করাতেও তাদের আলাপের বিরাম নেই।

"ভাষাটা তাদের অবোধ্য হলেও কাছাকাছি সবাই পুতুল-পিঁপিঁ আর বোরোত্রার আলাপের ধরনে হেসে কুটোপাটি হচ্ছে তখন। বিশুদ্ধ বাস্ক্-এ সেই আলাপের মর্ম বুঝলে তাদের মুখে কী ধরনের হাসি ফুটত তাই ভাবলাম।

"ওজন করাতে-করাতে বোরোত্রার বাঁ বগলের পিঁপিঁ তখন বলছে, 'খুব যে খুশি, না? প্লেনে গিয়ে ওঠার আর তর সইছে না!' বোরোত্রা যেন তাকে ধমক দিয়ে বলেছে, 'চুপ কর। তর সইছে না-সইছে, তাতে তোর কী?'

" 'আমার কী!' খ্যানখেনে হাসির সঙ্গে বলেছে পিঁপিঁ 'আরে আমারই তো সব। আমি ছাড়া তুই তো ঠুঁটো!'

" 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' বোরোত্রা যেন পিঁপিঁকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করেছে, 'সত্যিই তো, সব তো তোরই কেরামতি। আমি

তো এর পরের ঘাঁটিতেই নেমে যাব। তারপর তো তোরই খেল।'

" 'আমায় ফেলে তুই নেমে যাবি!' পিঁপিঁ একটু কাঁদুনে সুর ধরেই আবার তা ভুলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, 'কোথায় রেখে যাবি আমায়?'

" 'সে যেখানেই রেখে যাই না,' বলে একটু গরম হতে গিয়েই বোরোত্রা যেন ভয়ে ভয়ে নরম হয়ে বলেছে, 'রাখব, রাখব, ভাল জায়গাতেই রাখব। তুই তো ওই একরত্তি পুঁচকে একটা পুঁটলি, ওপরের তাকের লাইফবেল্টের ভেতরেই গোঁজা থাকলে কে খেয়াল করবে!'

" 'কেউ না! কেউ না!' পিঁপিঁ যেন খুশিতে ডগমগ হয়ে বলেছে, 'ওইখান থেকেই এমন খেল শুরু করব, একেবারে ফটকাবাজি। ফট্ ফট্...'

" 'থাম থাম, আহাম্মক কোথাকার।' বোরোত্রা তাকে আবার ধমক দিয়েছে, 'আর ফটকাবাজি দেখাতে হবে না। এদিকে দেরি হয়ে গেছে। পাখি ডালে গিয়ে বসেছে কিনা দেখা হয়নি।'

" 'বসেছে! বসেছে!' পিঁপিঁ প্রায় যেন নাচতে-নাচতে বলেছে, 'আমরা আসবার আগেই গিয়ে বসেছে নিশ্চয়! চল! চল!'

"ওজন-টোজনের ঝামেলা চুকিয়ে এক হাতে ঝোলানো একটা ব্যাগ আর এক-হাতে পিঁপিঁকে নিয়ে কাউন্টারের সকলের হাসির মধ্যে বোরোত্রা এবার তার প্লেনে গিয়ে ওঠবার পথে রওনা হয়েছে। কিন্তু দু'পা গিয়েই তাকে থামতে হয়েছে চমকে হতভম্ব হয়ে।

"অন্য সবাই যখন এটাও তার ভেনট্রিলোকুইজমের একটা প্যাঁচ মনে করে হেসে খুন, তখন বোরোত্রা নিজে বেশ দিশাহারা।

"তা দিশাহারা হওয়া আশ্চর্য কী? কাউন্টার ছেড়ে দু'পা না

যেতে-যেতেই তার পিঁপিঁই যেন ছুঁচলো গলায় তাকে সাবধান করে দিয়ে স্প্যানিশে বলেছে, 'আপনি কি হারাইতেছেন, আপনি জানেন না।'

"বলে কী পিঁপিঁ! আর বলছে কেমন করে? বেশ হতভম্ব হয়েও বোরোত্রা আবার তার ব্যাগ তুলে রওনা হওয়া মাত্র আবার পিঁপিঁ যেন ফরাসি ভাষায় সেই একই কথা তাকে শুনিয়েছে।

"বোরোত্রার সত্যিই তখন বেসামাল অবস্থা। মাথাটাই তার হঠাৎ বিগড়ে টিগড়ে গেছে বলে তার সন্দেহ হচ্ছে।

"মাথাতেই কিছু গণ্ডগোল না হলে এমন অদ্ভুত কাণ্ড হয় কী করে। তাও একবার আধবার কী! স্প্যানিশ আর ফরাসির পর জোর করে ব্যাগ তুলে নিয়ে পা বাড়াবামাত্র পিঁপিঁ খাস বাস্‌ক্-এই সেই একই কথা তাকে শুনিয়েছে, 'আপনি কি হারাইতেছেন আপনি জানেন না।'

"বোরোত্রার কাণ্ড দেখে তখন মনে হয়েছে, সে যেন পাগলের অভিনয় করছে। আশপাশের লোকে যত এটা তার মজার খেলা মনে করে হেসেছে, সে তত চিড়বিড়িয়ে উঠে, আর-কিছু না পেরে, এক দফা চুটিয়ে গালাগাল দিয়ে পিঁপিঁকেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সেখানকার মেঝের উপর।

"ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই যেন তার হুঁশ হয়েছে। তারপর যে-রকম অস্থির হয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সে পুতুলটা তুলে নিয়েছে, তা দেখবার মতো। সেইটুকু দেখেই হিসেবের ভুল কিছু যে আমার হয়নি তা বুঝে বোরোত্রার প্লেন ছাড়া পর্যন্ত বেয়াড়া কিছু ঘটে কিনা, তা একটু দেখে যাবার জন্যে এয়ারপোর্ট হোটেলেই গিয়ে একটু বসেছি।

"এয়ারপোর্ট হোটেলের একটা নিরিবিলি টেবিলে একলাই বসে-

বসে প্লেনের ভেতর বোরোত্রার অবস্থাটা যেন আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছি।

"কী অস্বস্তি নিয়েই সে যে তার সীটে বসে আছে, তা তার মুখের চেহারাতেও এখন আর লুকানো নেই নিশ্চয়ই।

"সীটটা এখন যেন তার কাছে কণ্টকাসন।

"কোনরকমে নিজের সে সীটটায় বসে আছে বটে, কিন্তু নজর তার প্লেনের ভেতরে ঢোকবার দরজাটার দিকে যেন আঠা দিয়ে আটকানো।

"নীচের ঢাকা-দেওয়া সিঁড়িটা সেইখানেই লাগানো। সেই সিঁড়ি বেয়েই এক-এক করে যাত্রীরা উঠে আসছে ভেতরে।

"কিন্তু যাত্রীরাও তো যা আসবার প্রায় সবাই এসে গিয়েছে। এখন যা আসছে তা তো বেশ একটু ফাঁক দিয়ে-দিয়ে দুএকজন মাত্র।

"তার মধ্যে হ্যু'ব্যারী কই?

"হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে অস্থির হয়ে উঠছে এবার বোরোত্রা, আর সময়ই তো নেই।

"মাত্র এক মিনিট, পঞ্চাশ সেকেণ্ড, পঁয়তাল্লিশ।

"প্লেনের দরজা ওরা বন্ধ করতে যাচ্ছে যে।

"নীচে দরজার গায়ে লাগানো সিঁড়িটা সরিয়ে ফেলেছে নাকি।

"বোরোত্রার মনের মধ্যে কী হচ্ছে, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি তখন।

"একটু দেরি হলেও হ্যু'ব্যারী শেষ মুহূর্তে ঠিক এসে পড়বে এই ছিল তার বিশ্বাস।

"সত্যি না এসে হ্যু'ব্যারী যাবে কোথায়?

"কিন্তু এখন কী করবে বোরোত্রা?

"নেমে যাবে প্লেন থেকে?

"সীট থেকে উঠে পড়তে গিয়ে তার পিঁপিঁর কাছেই সে পরামর্শ চাইছে নিশ্চয়।

"কী পবামর্শ দেয় পিঁপিঁ?

"পিঁপিঁ এখন চিঁচিঁ হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়। চিঁচিঁ করেই জানায়, 'কোথায় যাবি, এখন কি আর নামতে দেবে?'

" 'দেবে দেবে, কেন দেবে না!' ধমক দিয়ে আবাব উঠতে চেষ্টা কবে বোবোত্রা।

"পিপিঁর চিঁচিঁ আবার শোনা যায় নিশ্চয়, 'নামতে পাবলেও যাবি কোথায়? কোথায় এখন পাবি সে-হতভাগাকে? তাব চেয়ে চেপে বসে থেকে এবপব কী করবি ভেবেই নে না।'

"বোবোত্রা আবাব বসে পড়েছে দোনামোনা মুখে।

"পিঁপিঁর সঙ্গে কথাগুলো 'বাস্‌ক্‌'-এই হয়েছে সন্দেহ নেই।

"আশপাশেব লোকেরা কিছু বুঝতে না পেরে ভেনটি লোকুইজমের মজা পেয়েহ তখন হাসছে।

"সে-হাসিতে গা জ্বলে গেলেও বোরাত্রাকে বোকা-বোকা ভাল-মানুষের মুখ কবে থাকতে হচ্ছে জাদুকবের ভোল নিয়ে।

"মনেব ভেতর এখন তার ভাবনার তুফান চলছে।

"সে যা ভাবছে আমি সব টের পাচ্ছি।

"ভাবছে, হ্যু'ব্যারী তো শেষ মুহূর্তেও প্লেনে এসে উঠতে পারল না। কেন পারল না?

"ইচ্ছে করে হ্যু'ব্যারী যে এ-প্লেনটায় ওঠেনি, তা অবশ্য বোরোত্রার মাথাতেই আসছে না।

"হ্যু'ব্যারী নিশ্চয়ই কোনো কিছুতে আটকে গেছে এই সন্দেহই বোরোত্রার হচ্ছে।

"কিন্তু কিসে আটকাতে পারে ?

"কোনোরকম আকস্মিক দুর্ঘটনা ? হঠাৎ অসুখ-বিসুখ ?

"তেমন কোনো দারুণ দুর্ঘটনা কি হঠাৎ অসুখে একেবারে টেঁসে গেলে তার কাজ তো হাসিল হয়ে যায়।

"কিন্তু অত ভাগ্য কি তার হবে ? তাছাড়া অমন দৈব দুর্ঘটনায় কিছু হলে তার বাহাদুরির দাম সে কি পাবে ?

"না, ওরকম কিছু হয়ে কাজ নেই। আর যাই হোক, পরের ঘাঁটিতে নেমে তাকে ভাল করে খোঁজ নিতে হবে। দরকার হলে আবার ফিরেও যেতে হবে কলকাতায়।

"কিন্তু এদিকে পিঁপিঁর বুকের ভেতর প্রায় নিঃশব্দ ধুকধুকুনি যে সমানে চলেছে।

"ওই ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে জুড়ে যে শয়তানির প্যাঁচটি আছে, তা নির্ভুল ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ডের হিসেব ধরে ঠিক সময়টিতে প্রলয়কাণ্ড বাধাবে।

"সেই ব্যবস্থা করেই পিঁপিঁর ভেতর টাইম-বোমাটি লুকিয়ে সে হ্যু'ব্যারীর প্লেনেই টিকিট কেটে উঠেছে।

"সে মাঝপথে নেমে যাবার সময় টাইম-বোমা-লুকনো পুতুলটা ওপরের তাকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে যাবে। আর সেটা প্লেন আবার ছাড়বার পর সমস্ত প্লেনটাকেই চৌচির করে ফাটাবে। এমন পাকা প্ল্যান যে কোনোভাবে ভেস্তে যেতে পারে, তা সে ভাবতেই পারেনি।

"এখন এই পিঁপিঁ পুতুলটার সর্বনাশা শয়তানি প্যাঁচটা কাটিয়ে ভণ্ডুল না করে দিলেই নয়।

"বোরোত্রা কেমন করে বিপর্যয় ঘটাবে, তাও আমি ভাল করেই বুঝতে পেরেছি।

"একটু বাদেই পিঁপিঁকে নিয়ে সে বাথরুমে গিয়ে ঢুকবে। তারপর সেখানে গিয়ে পিঁপিঁর ছালচামড়া ছাড়িয়ে তার ভেতরের ঘড়িটা দেবে বন্ধ করে।

"পিঁপিঁকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে তাকে না-নিয়েই আবার ফিরে এলে তার যে-সব সহযাত্রী এতক্ষণ তার ভেনট্রিলোকুইজমে মজা পেয়েছে তারা একটু অবাক হয়ে পিঁপিঁর খোঁজ হয়তো নিতে পারে।

"তখন কী জবাব বোরোত্রা দেবে, সেটা তার দায়। আমার তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কী!

"বোরোত্রার প্লেনটা ছেড়ে যাবার বেশ খানিকক্ষণ পরে তাই আমি ফিরে আসবার জন্যে উঠেছি।

"তা এয়ারপোর্ট হোটেলে তো আর এমনি-এমনি বসে থাকা যায় না। তাই একটু খাবার-দাবার অর্ডার দিতে হয়েছিল। তা এত দিল যে, ওখানে শেষ করা যাবে না বলে কিছু প্যাক করিয়ে সঙ্গেও আনতে হয়েছে। সে-বাক্সটা..."

ঘনাদার মুখের কথা পড়তে-না-পড়তে পল্টুবাবু প্রায় জোড়হস্ত হয়ে বললেন, "সে খাবারের প্যাকেট আমি আপনার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি এই এদের বনোয়ারীকে দিয়ে।"

"ও, দিয়েছ!" ঘনাদা একটু প্রসন্ন হাসি দিয়ে পল্টুবাবুকে ধন্য করে কেদারা থেকে উঠে পড়ে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ একটা কথা যেন মনে পড়ায় থেমে গিয়ে বললেন, "কিন্তু আর-একটা মুশকিল হয়েছে। সঙ্গে তেমন কিছু নিয়ে তো বেরোইনি। ওই হোটেলে যাবার সময় ড্রাইভারের কাছে গোটা চল্লিশই যেন ধার করতে হয়েছিল। সেটা..."

"সে আপনি কিচ্ছু ভাববেন না।" পল্টুবাবু কৃতার্থ গলায়

বললেন, "ও-সব কিছুর যা করবার আমি করব। আপনি এখন বিশ্রাম করুন গিয়ে একটু।"

"হ্যাঁ, তাই করি।" বলে টঙের ঘরে যেতে-যেতে ঘনাদা আমাদের জন্যে একটু সহানুভূতি খরচ করে গেলেন, "তোমাদের বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ।"

আমাদের মুখগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখলে ঘনাদা আমাদের কৃতজ্ঞতার পরিমাণটা বুঝতে পারতেন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হওয়া পর্যন্ত কেন যে ঘনাদা আজ অমন অকাতরে আমাদের সঙ্গে খিদে-তেষ্টা অগ্রাহ্য করেছেন, তা বুঝে আমরা আরও অভিভূত।

ঘনাদাকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে নতুন ভক্ত পল্টুবাবুর ফিরে আসার পর তাঁকেই একটু নিশানা না বানিয়ে তাই পারলাম না।

বললাম, "বেরাল তো মিলেছে, কিন্তু তার গলায় ঘণ্টাটা বাঁধা হবে কী করে?"

"বেরাল!" পল্টুবাবু অবাক হয়ে বললে, "ঘনাদা বেরালের কথা তো কিছু বলেননি!"

সোজা করেই তাই বলতে হল, "আকাশের ছেঁদা, ওই সর্বার্থ-সাধিকা কালো ফুটো, ও তো শুনলাম দেড় দুই আলোকবর্ষ দূরে। তা ফুটোর গলায় উপগ্রহের বিদ্যুৎ-বানানো যন্ত্রবসানো হাঁসুলি পরানো হবে কী করে?"

প্রায় ঘনাদার মতোই নাসিকাধ্বনি করে নিজের পকেটের ঘনাদার-দেওয়া 'এনার্জি'র দানপত্র একটু নেড়ে নিয়ে পল্টুবাবু বললেন, "ওসব তোমাদের বোঝবার নয়।"

পল্টুবাবুর অন্ধ ভক্তির ছোঁয়াচ লেগেই আর একটা রহস্য হঠাৎ যেন পরিষ্কার হয়ে গেল।

ঘনাদার অনেক রকম বেয়াড়া আব্দার-অত্যাচারই আমরা অম্লান-বদনে সহ্য করে থাকি। কিন্তু আজকের এই অন্যের আনা গাড়ি নিয়ে এমন বেপরোয়া উধাও হয়ে যাওয়াটা তার পক্ষেও যেন বেশ একটু বাড়াবাড়ি। এটা যেন তাঁর গুল-সম্রাট চরিত্রের সঙ্গেও খাপ খায় না।

হঠাৎ এমন অস্বাভাবিক চরিত্রস্খলনের কারণটা কি!

কারণটা গৌরের মাথাতেই প্রথম ঝিলিক দিল।

"ঘনাদা আজ কিসের শোধ নিলেন বুঝতে পারছিস?"

গৌর বুঝিয়ে বলবার আগেই ব্যাপারটা আমাদের ভাল করেই মনে পড়ল। মাসখানেক আগেই আমাদের একটা ছোটখাটো বেয়াদপি হয়ে গেছে। বিকেলবেলা সেদিন ঘনাদাকে নিয়ে এক নাম-করা হোটেলে যাবার কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু খেলার মাঠে সর্ব-ভারত-প্রতিযোগিতায় বাংলাদলের অপ্রত্যাশিত হারে এমন মুষড়ে পড়েছিলাম সবাই যে মেসে ফিরে যাবার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম একরকম।

ঘনাদা সেজেগুজে রাত প্রায় ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে রামভুজের রান্নাতেই 'ডিনার' সারলেও, পরের দিন এ ব্যাপার যেন বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন।

মোটেই যে তিনি ভোলেন নি, আজকের এই প্রতিশোধই তার প্রমাণ।

এ কাহিনীর একটু অপ্রত্যাশিত উপসংহার আছে।

ঘনাদার সেদিনকার অন্য সব কীর্তির মোটামুটি কিছুটা ব্যাখ্যা পেলেও পল্টুবাবুর মোটরের ট্যাঙ্কের অতখানি তেল মাত্র দমদম এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যেতেই কেমন করে তিনি ফুরিয়ে এলেন, সেই ব্যাপারটা আমাদের কাছে মস্ত একটা ধাঁধা হয়ে ছিল।

আর যাই করুন, ঘনাদা তেলটা কাউকে বিক্রি নিশ্চয়ই করেননি।

তাহলে কি দান-খয়রাত করে এসেছেন ?

না, ওরকম উদারতা করে এসে থাকলে সেটার এক কড়া এতক্ষণে পাচ কাহন হয়ে উঠত নিশ্চয়।

তেল-খরচের রহস্যটা অমন আশাতীতভাবে আমাদের কাছে ফাঁস হয়ে যাবে তা ভাবিনি।

হল অবশ্য ঘনাদারই চরিত্র-মহিমায়।

পঞ্চম গেমে কার্পভের ভুল চালগুলো কর্চনয়ের বদলে ফিশার বা সে নিজে থাকলে কী করত, তাই আমাদের বোঝাচ্ছে, আর শিশির তার প্রতিবাদে ফিশার থাকলে কার্পভের কাছে যে তুলোধোনা হয়ে যেত গলার জোরে তা প্রমাণ করে, আমাদের আড্ডাঘর সরগরম করে তুলেছে, এমন সময় ভগ্নদূতের মতো দরজায় বনোয়ারীর আবির্ভাব।

হাতে কোন খাবার দাবারের খালি প্লেট ছাড়া নিরস্ত্র নিরাভরণ বনোয়ারীর আবির্ভাব আমাদের এ ঘরে বড় একটা হয় না।

হলে সংবাদটা কিছু গুরুতর বা চমকপ্রদই হয়ে থাকে।

এবারের সংবাদটা গুরুতর, না শুধু চমকপ্রদ, প্রথম শুনে ঠিক বোঝা গেল না।

বনোয়ারীর সংবাদ হল, ড্রাইভারজি আসিছে।

ড্রাইভারজি! আমরা তো অবাক। কে এই ড্রাইভারজি?

সন্দেহ ভঞ্জন হতে দেরি হল না। বনোয়ারীর ঘোষণার পরেই দরজায় ড্রাইভারজিকে দেখতে পাওয়া গেল।

প্রথমটা সত্যিই চিনতে পারিনি। চেনা একটু শক্তও বটে। ড্রাইভারজিকে আর আমরা কতটুকু দেখেছি? আর যাও বা দেখেছি তা অন্য বেশে-পরিবেশে।

ড্রাইভারজির বেশভূষা এখন আলাদা। ড্রাইভার-মার্কা ধরাচূড়ার বদলে গায়ে পাঞ্জাবি ধরনের কোর্তা, পরনে পাজামা, মাথায় মারাঠি টুপি।

ড্রাইভারজি দরজার ভেতর একটু ঢুকে দাঁড়িয়ে আমাদের সেলাম করে একটু কুণ্ঠিতভাবে রাষ্ট্র-প্রাদেশিক মেশানো ভাষায় হেসে জানালে, "বড়া বাবুকে সেলাম দেনে আসছি।"

ব্যাপারটা যখন প্রায় বুঝে ফেলেছি, ড্রাইভারজির পরের কথায়

তখন মাথাটা আবার একটু গুলিয়ে গেল।

আমাদের 'বোঝবার একটু সুবিধে করে দেবার জন্যে ড্রাইভারজি তার উল্লেখটা একটু বিস্তারিত করলে, "যো বড়াবাবুকে ও দিন কোল্যানি লিয়ে গেলাম।"

বড়াবাবু যে স্বয়ং ঘনাদা তা বুঝতে তখন আর বাকি নেই, কিন্তু কল্যাণীতে নিয়ে যাবার কথা কী বলছে ড্রাইভারজি ?

সে বিভ্রমের চেয়ে একটা শঙ্কিত সন্দেহই গোড়ায় প্রবল হয়ে উঠল।

ঘনাদা নিজেই কবুল করেছেন যে, ড্রাইভারজির কাছে তিনি কিছু ধার নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পল্টুবাবুও নিজেই সে-দেনা সম্বন্ধে তাকে ও আমাদের নিশ্চিন্ত হবার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

ঘনাদার সেই ধার শোধের ব্যাপারেই কিছু গলতি হয়ে গেছে নাকি পল্টুবাবুর ?

ড্রাইভারজি তারই তাগাদায় এসেছে ?

উদ্বিগ্ন হয়ে তাই জিজ্ঞাসা করতে হল আমাদের, "বড়া বাবুকে যা দিয়েছিলে তোমার সে টাকা কি..."

কথাটা শেষ করা গেল না। ওইটুকু বলা হতেই ড্রাইভারজি লজ্জিতভাবে জিভ কেটে বলল, "রাম! রাম! বড়াবাবু সে রূপয়া তো হমার কোম্পানির বাবুর মারফত ভেজে দিয়েছে ওই-দিনেই। আর না দিলে ভি ও-রূপয়া মাঙতে আসব হামি বড়াবাবুর কাছে!"

একটু থেমে একটু লজ্জা লজ্জা ভাব করে বললে, "কাল রামনবমী, তাই আমি আসিয়েছে।"

রামনবমী! তাই এসেছে ড্রাইভারজি! আমরা হতভম্ব হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

রামনবমীর নামে আসা মানে বখশিসের আশায় যে আসা নয় তা তো ড্রাইভারজির আগের আলাপেই পরিষ্কার হয়ে গেছে।

তাহলে?

ড্রাইভারজির পরের কথায় রহস্যটা একসঙ্গে কিছুটা পরিষ্কার ও রীতিমত ঘনীভূত হয়ে উঠল।

"কালসে তুলসীদাসজির পূজায় 'অখণ্ড' রামায়ণ পাঠ হোবে কিনা উস লিয়ে বড়াবাবুকে বোলাতে এসেছি।'

মাথায় এবার চরকিপাক লাগা অন্যায় কিছু নয় নিশ্চয়। রাম-নবমীতে তুলসীদাসের সম্মানে 'অখণ্ড' রামায়ণ পাঠ হবে তার সঙ্গে ঘনাদার কি সম্বন্ধ?

সম্বন্ধটা ড্রাইভারজির ব্যাখ্যাতেই ভাল করে জানা গেল।

ঘনাদার অনেক আশ্চর্য গুণাগুণ আর ক্ষমতার কথা আমরা জানি, কিন্তু তিনি যে একজন অসামান্য অপরূপ রামায়ণ গায়ক, সারা তুলসীদাসের সপ্তকাণ্ড রাম-চরিত মানসই যে তাঁর প্রায় মুখস্থ, এই অবিশ্বাস্য খবরটা ড্রাইভারজির কাছেই প্রথম পেলাম। তেল ফুরোবার পর দমদম থেকে প্রায় সমস্ত রাস্তাটাই ভাড়াটে লোক দিয়ে গাড়ি মেস পর্যন্ত ঠেলে আনবার সময় ঘনাদা নাকি তুলসীদাসী 'রাম-চরিত-মানস'-এর শ্লোক গেয়ে শুনিয়েই ড্রাইভারজি আর ঠেলাদারদের পর্যন্ত মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। আসন্ন রামনবমী উৎসবে 'অখণ্ড' রামায়ণ পাঠের ভার নিতেও সেদিন তিনি নাকি রাজী হয়েছিলেন।

ড্রাইভারজি তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে আজ তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছে।

সেদিন দায়ে পড়ে ঘনাদা যা করেছেন ও বলেছেন তা যতই অদ্ভুত ও চমকদার হোক আজ তার জের টানতে তিনি উৎসাহী হবেন বলে

তো বিশ্বাস হয় না। কি ভাগ্য তিনি এখন তাঁর সরোবর-সভা সান্ধ্য বৈঠকে গেছেন। তাঁকে বাঁচাবার জন্যে গৌরই বুদ্ধি করে বলল, "সব তো ঠিক ছিল ড্রাইভারজি, কিন্তু বড়ি আফ্‌শোষ কি বাত যে বিলাইত সে এক সাহাব অচানক আকে উনকো দূর কাঁহা টহলমে লিয়ে গেছে! কব যে লৌটেঙ্গে কুছ ঠিক নহি। তাই তোমাদের 'অখণ্ড' রামায়ণ পাঠ উনি আর এবার করতে পারলেন না।"

ড্রাইভারজি একটু হতাশ হয়েই তারপর চলে গেল।

ঘনাদার ভাগ্য ভাল যে, তিনি এ সময়ে যথারীতি তাঁর সরোবর-সভায় গিয়েছেন।

তাঁর ভাগ্য ভাল বলব, না আমাদের ভাগ্যটাই মন্দ?

ঘনাদা বাহাত্তর নম্বরে এখন উপস্থিত থাকলে ড্রাইভারজিকে সামলাবার হয়তো আরেকটা কাহিনী শোনার ভাগ্য আমাদের হত!